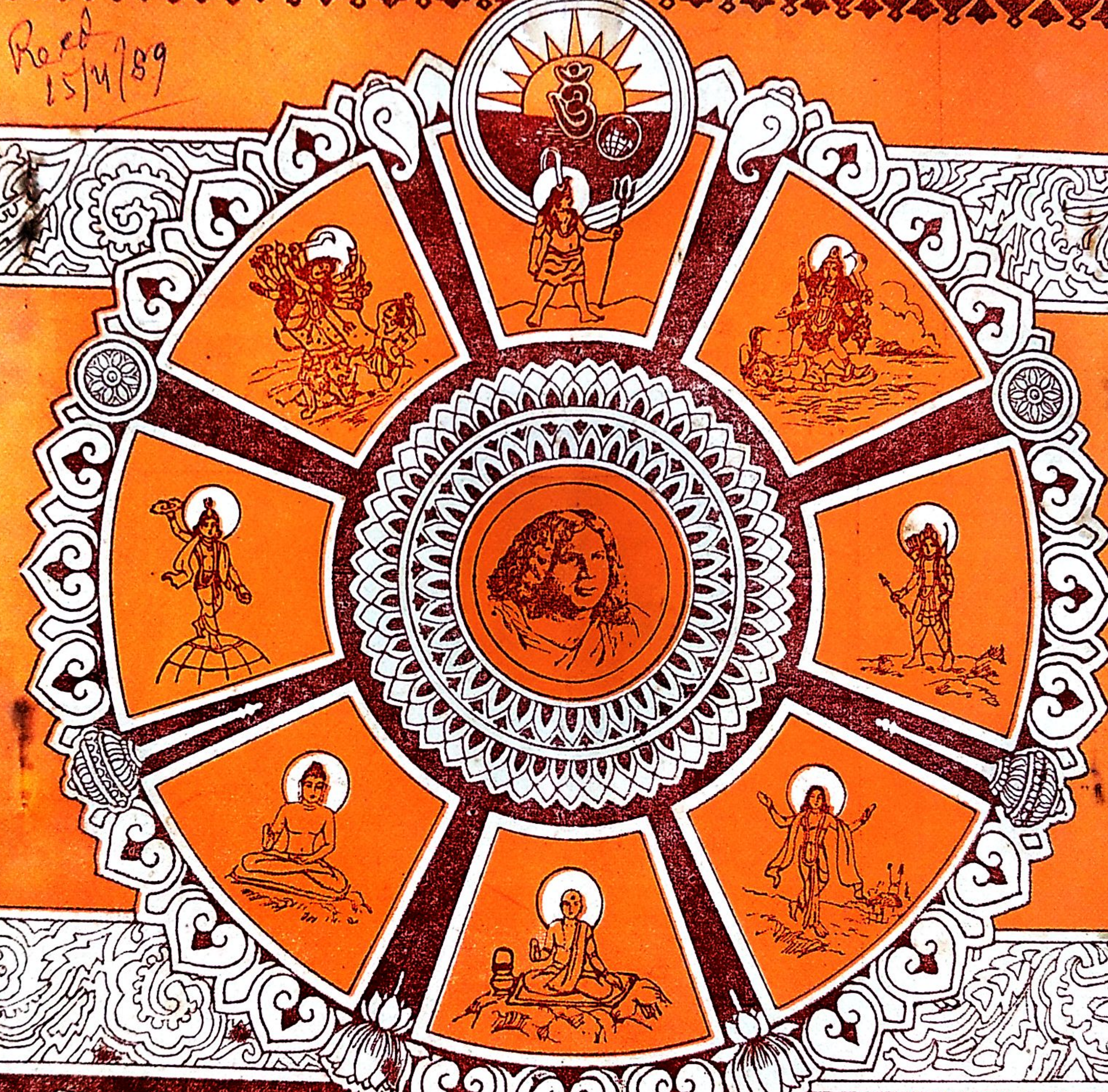
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র

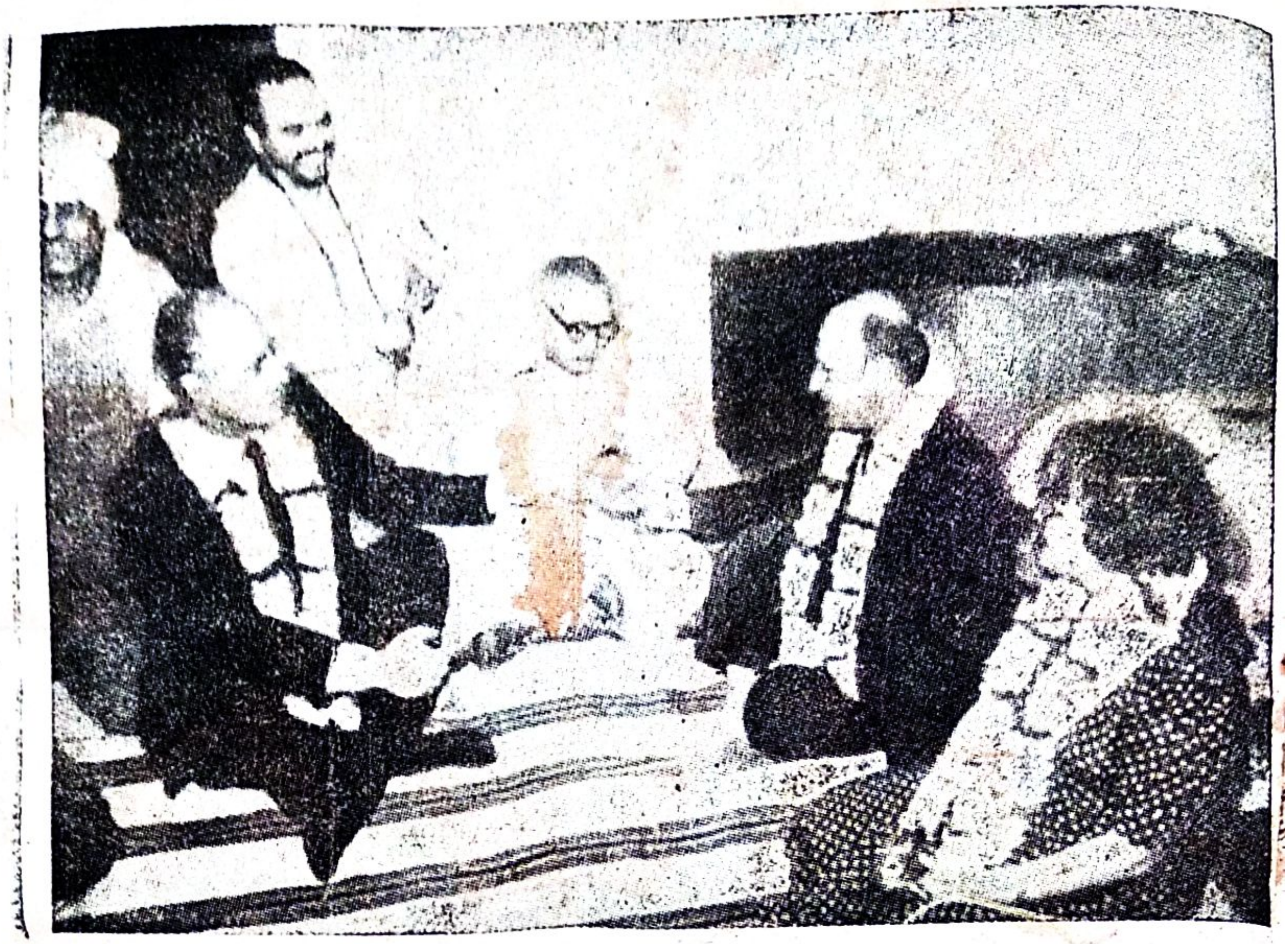
প্রণব

ধর্ম্ম ও জাতীয়তার বাণী



৬২তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।
চৈত্র—১৩৯৫

বার্ষিক মূল্য-২০.০০
এই সংখ্যা-৩.০০



পূজনীয় শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিনিধিদলের নেতা সহকারী শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এন. এস. ইকরভ সঙ্ঘের কলিকাতা প্রধান কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎ করেন।



নানা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনকালে শ্রীমৎ বড় স্বামীজী একটি শিশুর শিরস্পর্শ করে আশীর্বাদ করছেন

প্রণব—চৈত্র, ১৩৯৫

সূচীপত্র

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বেশ কিছুদিন যাবৎ মুদ্রণের কাগজ, মুদ্রণব্যয়, ডাকব্যয় ও আনুসঙ্গিক ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান। বিগত কতিপয় বৎসর আমরা সডাক ষোল টাকা মাত্র বার্ষিক চাঁদায় ভর্তুকি দিয়া প্রণব চালাইয়া আসিতেছিলাম। প্রণবের সহৃদয় গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী, বৈশাখ (১৩৯৬) হইতে প্রণবের বার্ষিক চাঁদা ১৬·০০ (ষোল) টাকা স্থলে ২০·০০ (কুড়ি) টাকা ধার্য্য করিতে হইতেছে।

যে সমস্ত গ্রাহক ১৩৯৬ সালের দরুণ ইতঃপূর্বে ষোল টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা বর্দ্ধিত হারে ৪·০০ (চার) টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। নচেৎ ১০ মাসের জন্য তাঁহাদিগকে গ্রাহক করা হইবে। আশা করি, এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকগণ আমাদের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন।

—কার্যাধ্যক্ষ, প্রণব

প্রণবের নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি

১। বৈশাখে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা; প্রতি সংখ্যা দুই টাকা মাত্র।

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার কুপনে পুরো নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর এবং নূতন গ্রাহক 'নূতন' কথাটি লিখবেন।

৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে দেওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিন। বার বার ডাকের গোলমাল হলে Post Master General, West Bengal Circle, Calcutta-1 ঠিকানায় লিখুন।

৪। চাঁদার মেয়াদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ যাবে। সেই অনুসারে চাঁদা পাঠাবেন।

৫। প্রণব অফিসে এসে চাঁদা জমা দেওয়ার সময় সকাল ৭টা থেকে ১১টা। বিকাল ২-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ মিঃ।

লেখকগণের প্রতি

১। সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পুরাকীর্তি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর দায়ী নহেন। আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশিত হয় না।

২। রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করবেন। তা না হলে লেখা বিবেচিত হয় না।

৩। কাগজের এক পিঠে যথেষ্ট মার্জিন রেখে সুস্পষ্টভাবে লিখবেন। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হাতের লেখা গৃহীত হয় না

৪। লেখক কপি রেখে তাঁর পুরো নাম ঠিকানা সহ লেখা পাঠাবেন। অননুমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরং দেওয়া হয় না। লেখার সাথে খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন না। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানিয়ে দেব, কিন্তু লেখা ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে পত্রালাপের জন্য অনুরোধ করবেন না। ইতি—

স্বামী নির্ম্মলানন্দ, সম্পাদক, প্রণব

প্রণব

ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিশেষ সংখ্যা

ধর্ম্ম কি ?	মহাপুণ্য কি ?
ত্যাগ	বীরত্ব
সংযম	পুরুষত্ব
সত্য	মনুষ্যত্ব
ব্রহ্মচর্য্য	মুমুক্ষুত্ব



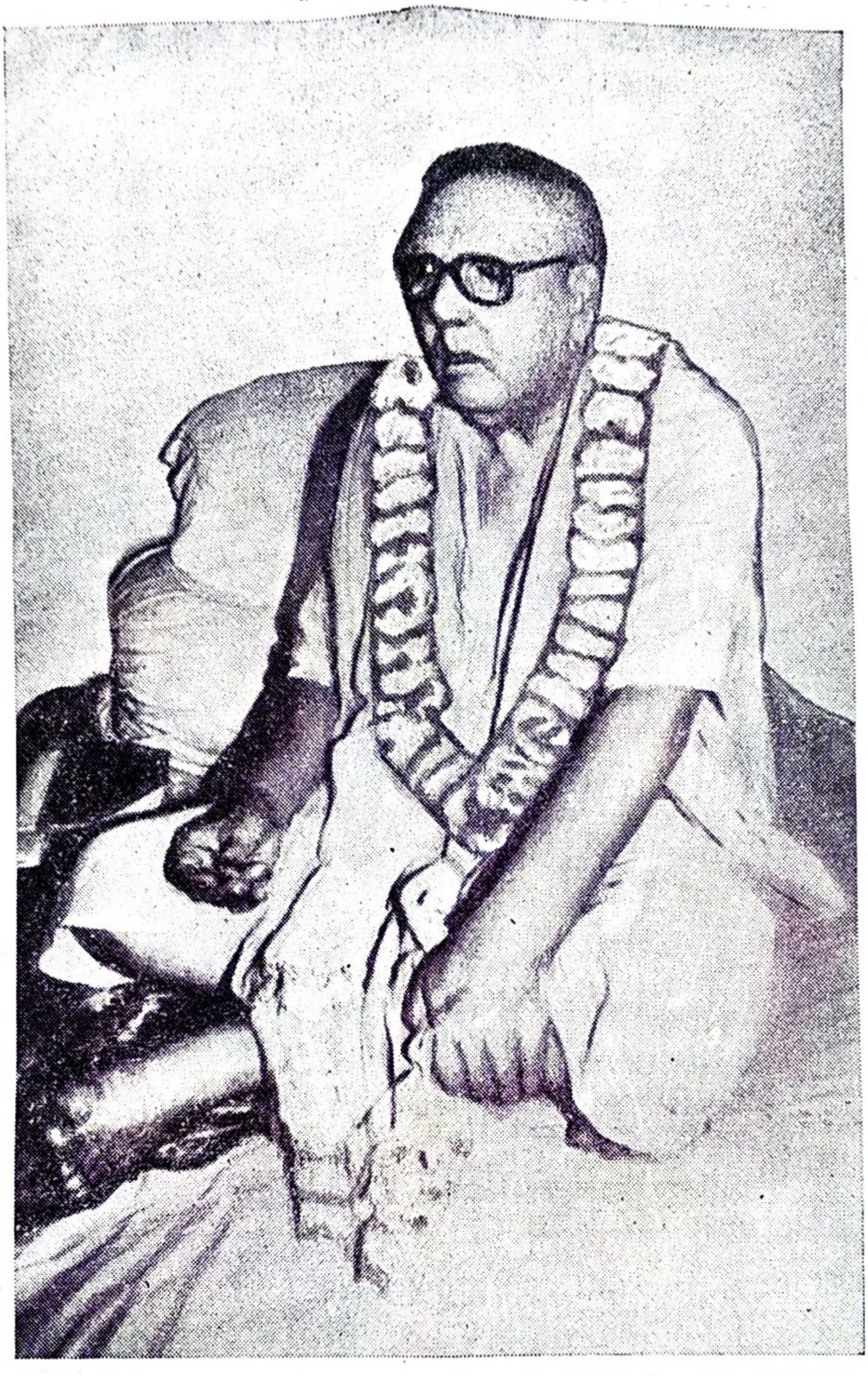
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

৬২তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯৫
সম্পাদক—স্বামী নির্ম্মলানন্দ
প্রণব কার্য্যালয় : ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-১৯, ফোন ৪৬-১১৭৮

যুগবাণী

"বিবেক-বৈরাগ্য ত্যাগীদের একমাত্র সম্বল। তোমাদিগকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি হইতে হইবে। তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া আর্য্য ঋষিদের আসনে উপবেশন করিয়া এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবে। নীতি ও ধর্মের কথা প্রচার করিবার জন্য, ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য বিঘোষণ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ—এই বিশ্বাস যেন নিয়ত থাকে। এই জাতীয় বিশ্বাসই যাবতীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ।"

স্বামী প্রণবানন্দ



পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ
(শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ)

আবির্ভাব :
১০ই (সৌর) ফাল্গুন, মঙ্গলবার
শুক্লা একাদশী, ১৮২০ শকাব্দ,
বাং ১৩০৫, ইং ১৮৯৯

তিরোভাব :
২৪শে পৌষ, শুক্ল প্রতিপদ, ১৩৯৫
ইং ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৯, রবিবার
শকাব্দ ১৯১০

সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের একটি পত্র

[শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার প্রথম খণ্ডের এক নম্বর এই পত্রটি শ্রীমদাচার্য্যদেব তদীয় সংসারত্যাগী প্রথম লীলাপার্ষদ্ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের নিকট লিখেছিলেন। ঐ সময় শ্রীমৎ স্বামীজী হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে সাধন-ভজন-তপস্যায় বৈরাগ্যময় জীবন যাপনে নিরত। যুগাচার্য্যদেব তদীয় ভবিষ্য জগন্মঙ্গল কর্ম্মপরিকল্পনার রূপায়ণে চিহ্নিত এই লীলাসঙ্গীকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য এই পত্রের মাধ্যমে প্রেরণা সঞ্চার করেন।]

বাজিতপুর সেবাশ্রম

পৌষ—১৩২৬, জানুয়ারী—১৯২০

স্নেহের—

ক্রমান্বয়ে তোমার দুই খানা পত্র পাইয়াছি। বর্তমানে তুমি যেখানে আছ তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী স্থান। দৈনিক শাস্ত্রালোচনা করিও, দৈনিক নিয়মিত ভাবে গীতা, উপনিষদ্ এবং যোগাবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যশতক ও অন্যান্য বৈরাগ্য-ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিও। ৪।৪॥ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইও না। শঙ্করাচার্য্যের বিবেক-বৈরাগ্য বুদ্ধের ত্যাগ এবং চৈতন্যের প্রেমের বিষয় ভাবিও।

পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বালক প্রহ্লাদ হস্তীর পদ-তলে নিষ্পেষিত হইল, সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপিত হইল, সুমহান্ পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিপাতিত হইল, কাল সর্পের দ্বারা দংশিত হইল; তথাপি তিনি হরিনাম জপ ত্যাগ করিলেন না; অচল অটল অটুটভাবে নিজের ভাব রক্ষা করিলেন।

যম-নিয়ম-আসন অভ্যাস করিও। কোনও একটি নির্দিষ্ট আসনে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। যে সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের বিষয় তুমি জান তাহাদের চরিত্র প্রত্যহ চিন্তা করিও। কোনও সময়ের জন্য কোন মুহূর্ত্তের জন্য যেন বাজে ভাবনা-চিন্তা মনে না আসিতে পারে। সতত সৎচিন্তা, সদ্ভাবনা, সৎসঙ্কল্প করিবে যাহাতে মানসিক কুবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।·· র জীবনের উন্নতির মূল গোড়াতেই তাহার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল। তোমারও তাহাই প্রয়োজন।

তুমি আর সংসারের মুখপানে তাকাইও না, সংসারের বিষয় ভাবিও না। পরিত্যাজ্য ও পরিত্যক্ত বিষয় বা বস্তু যেমন আমাদের স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, তেমনি সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি যেন তোমার ঘৃণা বোধ হয়। যে বিষয়কে বিষ ও বিষ্ঠাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছ— তাহাকে যেন আর কখনও অমৃতজ্ঞানে ধরিতে না হয়।

যে সমস্ত ছেলের কথা তুমি লিখিয়া থাক, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংসারে আছে, আর তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। তোমার ও তাহাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাহারা ত্যাগী হইতে চায় ও চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তোমার মত ত্যাগী হইতে পারিতেছে না। যে পর্য্যন্ত তাহারা সমস্ত কিছু ত্যাগ করিতে না পারিবে সেই পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করা তো দূরের কথা, তাহা শুনিতে বা বুঝিতেও পারিবে না। সুতরাং, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে বহির্মুখী হইতে দিও না।

দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা জপ-ধ্যান করিও। অনেক সময় মৌন থাকিও। এমন অবস্থায় সব সময়

থাকিতে চেষ্টা করিবে - যেন বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি-সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেক বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে নিতে পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইতে থাকিবে। তোমরা যে পথের পথিক হইয়াছ—যদি সর্বদা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাক, তবে কোন প্রলোভনই তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভোগীর মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। সতত সাবধানে থাকিও এবং সর্ব্বদা মনে করিও—আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি সর্বত্যাগী; আমি সর্বত্যাগী—এরূপ করিলে তোমাকে কোন ভোগ স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতি—

প্রাপক
হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রম

আশীর্বাদক
স্বাঃ স্বামী প্রণবানন্দ

পরমপূজ্যপাদ-কর্ম্মপ্রেমমূর্তি-ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-সভাপতিরনন্ত শ্রীবিভূষিত-

স্বামিসচ্চিদানন্দদেবস্য পরব্রহ্মণি বিলীনে

বাঙ্ময়ী পূজা

আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, এম-এ, পি-এইচ-ডি, বাচস্পতি

(১)

শীর্ণাশেষ-বিয়োগদুঃখ-বিধুরা রোরুদ্যমানা ভৃশং
শ্যামাপাঙ্গ সিতাশ্রুবিন্দুনিচয়া ক্লিষ্টেব পদ্মচ্ছটা।
স্তব্ধীভূত-বিহঙ্গকণ্ঠ-কবিতা শোকাকুলা ভারতী
মৌনং শোচতি বঙ্গসাগরজলৈঃ স্রোতস্বিনী জাহ্নবী ॥

(২)

স্থানং তেঽস্তু সুরেন্দ্র-দিব্যভবনে সঙ্গীতরম্যোজ্জ্বলে
কিং কুর্মস্তব পুণ্য-বন্দন-বিধৌ শোকাকুলা স্মো বয়ম্।
দীনৈস্তদ্-বিরহার্ত-বান্ধবজনৈর্ভক্ত্যা প্রদত্তাঞ্জলিম্
তপ্তোচ্ছ্বাসযুতাং গৃহাণ কৃপয়া কারুণ্যরত্নাকর ॥

(৩)

স্মারং স্মারং শিবগুরুপদং ব্রহ্মভূতং শরণ্যং
ধ্যায়ন্নিষ্টং হৃদি বিলসিতং মুক্তিদং চিন্ময়েশম্।
যোগাসীনঃ স্মরহরপুরে জাহ্নবীপুণ্যনীরে
সংজীবস্ত্বং পরম নিলয়ে শৈলধারেব সিন্ধৌ ॥

(৪)

স্বামিনং সচ্চিদানন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।
লোকসংগ্রাহকং নৌমি প্রেমবীর্যস্বরূপকম্ ॥

(৫)

সঙ্ঘো বির্ধতাং নিত্যং দেশে দেশে নিরন্তরম্।
নমস্তু হিন্দবঃ সর্বে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ॥

পূজ্য স্বামীজীর সংসারত্যাগ ঃ নিজ কণ্ঠে

(অনুলিখন—স্বামী নির্ম্মলানন্দ)

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে পূজ্য বড় স্বামীজী চিরতরে সংসার ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় পূর্ব্ব থেকেই সংসারের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি ভাবটা প্রকট হয়ে উঠছিল। শ্রীমৎ আত্মানন্দজীর মুখে শুনেছি, তিনি ঘরবাড়ীর মায়া ছেড়ে অল্পকালের জন্য নানা স্থানে ঘুরেছেন। শেষে ফিরে এসে শ্রীমৎ আত্মানন্দজীদের (তৎকালে নিকুঞ্জ) বহির্বাটীতে থাকতেন। কিন্তু সময় ও সুযোগ খুঁজছিলেন চূড়ান্তভাবে গৃহত্যাগের।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে। সময় অপরাহ্ণ। স্থান—কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়; শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের বিশ্রাম-মন্দির। পূজ্য বড় স্বামীজীকে ঘিরে আমরা কয়েক জন গুরুভ্রাতা ইষ্টপ্রসঙ্গে মগ্ন। মূল বক্তা অবশ্য বড় স্বামীজী স্বয়ং। এই দিন নিজ গৃহত্যাগের কাহিনীটি নিজেই শুনান স্নেহাস্পদ গুরুভ্রাতাদের। বলেন—"দেখ মাকে যে ত্যাগ করতে পারে, জগতের সকলকেই সে ত্যাগ করতে পারে। মাকে ত্যাগ করাই বড় কঠিন। মা হলেন স্নেহ-মায়া-মমতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা।"

অত:পর নিজের প্রসঙ্গ। স্বামীজী বলতে থাকেন—"আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন স্কুলে যেতাম (বাজিতপুর রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয়), মা গ্রামের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জননীর দুচোখ বেয়ে অঝোরে ঝরতো অশ্রুধারা। যতক্ষণ দৃষ্টির বাইরে না যাই, ততক্ষণ তিনি পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন অপলক দৃষ্টিতে। অথচ, ব্যাপারটা কিছুই নয়। স্কুলে যাচ্ছি, শনিবার বিকেল পর্য্যন্ত দিদির বাড়ী থাকবো, * সপ্তাহ শেষে বাড়ী ফিরে আসবো।"

"কেন, মা এত বিহ্বলা হতেন ?"—প্রশ্ন করি।

"জান, আমার ভাব দেখে সকলেই বুঝে নিয়েছিল যে, এ ছেলে ঘরে থাকবার নয়। আর এ ব্যাপারে সকলে দোষারোপ করতো বিনোদ ব্রহ্মচারীকে (স্বামী প্রণবানন্দ)। বলতো—ঐ সাধুই ভাল ছেলেগুলির মাথা খাচ্ছে।"—উত্তর দেন পূজ্য স্বামীজী।

এগিয়ে চলে প্রসঙ্গ। ঘরে বাঁধবার জন্য বিবাহ দেবার প্রস্তাব এসেছিল মায়ের কাছ থেকে। তাও বলেন অকপটে। মায়ের কাছে তাঁর উত্তর কিন্তু ছিল সুস্পষ্ট—

"দেখ মা, সন্ন্যাসী হব কি না ঠিক নেই। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে তোমার সেবার জন্য গৃহেও থাকতে পারি, কিন্তু বিবাহ নয় ঠিক জেনো। পরের মেয়ে এসে তোমাকে গালি দিবে তা আমি সহ্য করবো না। ঐ যে বউরা (স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূরা) তোমাকে গালি দেয় †।" ব'লেই মহাপুরুষের মুখে এক গাল হাসি। সেই সরলতামাখা হাস্যরসে আমরাও হই একাত্ম।

অতঃপর গৃহত্যাগের মূল প্রসঙ্গে আসেন। বলেন—"একবার মায়ের খুব অসুখ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তখন আমি গৃহত্যাগ করি। মাকে বলি—আমি দিদির বাড়ী যাচ্ছি (শ্রীমৎ যোগানন্দজীর মাতৃদেবী) দিদিকে আনতে। দিদি না এলে তোমার সেবা করবে কে ? পালং যাই। মায়ের অসুখের খবর শুনাই। দিদিকে রওনা করিয়ে দিয়ে বলি—ফরিদপুর কলেজটা দেখে আসি। এই ব'লে চলে যাই নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে। সেই যে সংসার ছাড়লাম সেই ছাড়াই ছাড়া। কলকাতা এসে একেবারে কাশীর টিকেট কাটি। (হাস্য)

কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উঠি। সেখানে গিয়ে স্বামীজী মহারাজের মত (তৎকালে ব্রহ্মচারী বিনোদ) সাদা কাপড় ও সাদা চাদর পরে সেজে গুজে সাধুর দলে ভিড়ে পড়ি।"

স্বামীজীর কথা শেষ। পরের ঘটনা। কিছুদিন মাত্র

---

* বাজিতপুরের সম্ভ্রান্ত মজুমদার পরিবারে স্বামীজীর এক ভগ্নীর বিবাহ হয়। ভগ্নিপতির নাম শ্রীবিপিন মজুমদার। † কথায় প্রত্যুত্তর করে।

অদ্বৈত আশ্রমে সেবকরূপে অতিবাহিত করে তিনি যাত্রা করেন হিমালয় অভিমুখে। গিয়ে উঠেন হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে। নিরত হন কঠোর তপশ্চর্য্যায়। উনিশ বৎসর বয়সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ তপস্বীর অন্তঃকরণে সন্ন্যাস লাভের তীব্র ব্যাকুলতা। নেমে আসেন হরিদ্বারে মহাপুরুষ শ্রীমৎ ভোলানন্দজী গিরি মহারাজের পূত সান্নিধ্যে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গিরিজী মহারাজ প্রথম বাজিতপুর পল্লীতে শুভ পদার্পণ করেন। মাদারীপুর থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন ব্রহ্মচারী বিনোদই—গ্রামবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে। সেই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ যোগীর প্রতি মহাপুরুষ একান্তভাবেই আকৃষ্ট। কুমুদ (পূজ্য বড় স্বামীজী) বাজিতপুর থেকে হিমালয়ে তপস্যায় এসেছে শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন—"বাজিতপুর সে আয়া? উহা বিনোদ নহি হ্যায়? ওহ্ জ্যোতিঃ হ্যায়! প্রেমিক হ্যায়! আভিতক্ কোই লড়্‌কী কো ছুঁয়া ভী নেহি।" তুমি বাজিতপুর থেকে এসেছ? কেন, ওখানে বিনোদ আছে না? সে এক জ্যোতিঃ, সে এক প্রেমিক পুরুষ। পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়। কোন নারীকে সে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না।

কুমুদের কি এ তত্ত্ব অজানা? সে তো তাঁরই আদেশে এসেছে হিমালয়ে তপস্যায়। তখনো পর্য্যন্ত বাজিতপুরে পূর্ণাঙ্গ কোন আশ্রম গড়ে উঠেনি, যেখানে ত্যাগীদের আশ্রয় ও আহার্য্যদানের বন্দোবস্ত হয়। অথচ, কুমুদ একান্তভাবে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত। সংসারবন্ধন তার কাছে অসহ্য। তাই ব্রহ্মচারী কর্তৃক তাকে হিমালয়ে তপস্যার অনুমতি দান। কিন্তু হিমালয়ের চৌম্বক শক্তি আর কতটুকু? তপঃসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর ব্রহ্মচারীর অভাব কুমুদকে আকুল ব্যাকুল ক'রে তোলে। সেই আকর্ষণ হিমালয়ের শক্তি অপেক্ষাও দুর্নিবার। কুমুদ ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই নেমে আসেন নীচে মাটির জগতে। বাজিতপুর প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনর্মিলিত হন যুগাবতারের শ্রীচরণমূলে। তিনি যে তাঁরই অন্যতম চিহ্নিত লীলাপার্ষদ্। শুরু হয় আত্মমুক্তির সাধনার তীব্রতার সহিত দুর্গত সমাজ ও জাতির নিষ্কাম সেবাব্রত।

অতঃপর ইং ১৯২৪ সালে সন্ন্যাসলাভ।

মোক্ষলব্ধ স্বামী সচ্চিদানন্দস্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শ্রীগুরু প্রণবানন্দ-প্রবর্তিত পথে
বিশাল ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘটিরে
সুপরিচালিত করি' দার্ঢ্যে ধীরে ধীরে,
সচ্চিৎ-আনন্দ-সাধু জাগ্রত জগতে
শিষ্য-ভক্ত সবে আনি' দীক্ষাদিষ্ট মতে,
মহাকাল-উদধিতে অর্পি' প্রাণোর্মিরে,
মোক্ষ-লাভে প্রত্যাবৃত্ত হোলো ঐশী নীড়ে।
এ সাধ্য সাধনই সাধে সম্বুদ্ধ মহতে।
শিষ্য-ভক্ত—সেবাদর্শ-সাধন-তৎপর,
পুণ্যময় মহতের আশিসে প্রীতির,
স্মৃতি-স্নাত হ'য়ে যদি যাচে নিরন্তর,—
শিব-ধাম হোক্ মর্ত্য-মিলন-মন্দির,
তবেই প্রণবানন্দ-লীলার অমর
সেবক-সেবিত পাবে অমৃত স্থৈর্য্য।

স্বর্গাশ্রম হইতে মানবতার সেবায়

[স্বামী আত্মানন্দজীর দিনলিপি হইতে]

স্থান—আশ্রম কুটির

তারিখ—১৬ই ভাদ্র, ১৩২৭ সন, ইং সেপ্টেম্বর—১৯২০

বেলা প্রায় একটা। আজ একাকীই আসিয়াছি। আশ্রম-কুটির তালাবদ্ধ। কিছু সময় শেওড়াগাছ তলায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। পার্শ্বস্থিত খালের স্রোত দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম ও ভাবিলাম—এমনিভাবে জীবনের স্রোতও সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টায় দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু কোথায়? কী ইহার পরিণাম, কোথায়ই বা ইহার পরিণতি! অনন্ত কালসাগরে একটি তরঙ্গ—মুহূর্ত্তে উত্থান, আর মুহূর্ত্তে বিলয়? ইহাই কি জীবন!

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়িল। খালের ওপার হইতে পুলের উপর দিয়া আচার্য্যদেব আসিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি একবার তাকাইয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে আমাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তালা খুলিয়া কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরের প্রকোষ্ঠে একটি মোটা পাটি পাতা। সেখানে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে খুটি ঠেস দিয়া বসিলেন। আমিও যাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। প্রথমে তিনি নানা প্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিয়া পরে জানাইলেন—"কুমুদ আসিয়াছে। তাহার সারা গায় খোস পাঁচড়া। বড় কষ্ট পাইতেছে। কয়েক দিন তোমাদের ওখানে নিয়া রাখিলে এবং ভালভাবে সেবাযত্ন করিলে সারিয়া উঠিবে। এখানে তো কোন ব্যবস্থা নাই। খুলনায় সে একাকী থাকে। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। একে তো নিজের সম্বন্ধে কোন খেয়াল নাই, তাহার উপর সময়ও পায় না। তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। তাড়াতাড়ি সুস্থ করিয়া খুলনায় পাঠানো দরকার।"

বহু দিন শ্রীযুক্ত কুমুদ দা'র সহিত দেখা হয় নাই। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া প্রাণমন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। আমি সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তিনি কোথায় আছেন?' আচার্য্যদেব বলিলেন, 'প্রার্থনা কুটিরে'। সেখানে যাইয়া দেখিলাম—তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। আমি নিকটে যাইয়া বসিলাম এবং আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশের কথা জানাইলাম। শ্রীযুক্ত কুমুদ দা যেন একটু রুষ্ট হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আমি কি তোমাদের ওখানে যাওয়ার জন্য আসিয়াছি? আমি আশ্রমে আসিয়াছি, আশ্রমেই থাকিব।" আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। তাহার পর তিনি আমার ধর্ম্মজীবন, দৈনন্দিন জীবনচর্য্যা ও অন্যান্য অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের নিকট ঘন ঘন আসিবার জন্য এবং শীঘ্রই যাহাতে ত্যাগব্রত গ্রহণ করিতে পারি তদুপযোগী করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ ভাবে বলিলেন।

তাহার পর আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কী কাজ করিতে হয়? শ্রীযুক্ত কুমুদদা' ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর দিলেন—'ভিক্ষা করিতে হয়।' আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"কেন? ভিক্ষাই তো সাধুর জীবনব্রত, সাধনা। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ।" সেই ভিক্ষা স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তি বা উদরপূর্ত্তির জন্য, আর আমাদের ভিক্ষা ধর্ম্ম-প্রচার ও দেশ-জাতি-সমাজের উন্নয়ন কার্য্যের জন্য। শুধু তাই নয়, ইহার দ্বারা মান-অভিমান নষ্ট হয়; আলস্য-জড়তা-নিদ্রা-তন্দ্রা দূর হয়, বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত থাকে। এক কথায় আত্মকল্যাণ ও জগৎকল্যাণ উভয়ই এক সঙ্গে হয়। আমি যখন হৃষীকেশের সাধন-কুটির হইতে আচার্য্যদেবের আদেশে এখানে আসিলাম তখন তিনি বলিলেন—আশ্রমের তো কোন আয় নাই, খরচ চলিবে কেমন করিয়া? তোমাকে

গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারি ঠিক করিয়া দেই। তাহা হইলে খরচ চলিয়া যাইবে। আমি রাগ করিয়া উত্তর দিলাম—তাহা তো বাড়ীতে থাকিয়াই ভাল ভাবে করিতে পারিতাম। তবে এখানে আসিলাম কেন? আচার্যদেব তখন হাসিয়া বলিলেন—তাহা না হইলে তো ভিক্ষা করিতে হয়, পারিবে? আমি উত্তরে জানাইলাম—কেন পারিব না, হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে তো সত্রে সত্রে ভিক্ষা করিয়াই খাইতে হইয়াছে। তখন আচার্যদেব সমস্ত বিষয় আরও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—হরিদ্বারে সত্রে ভিক্ষা ও এখানকার পরিচিত জনসাধারণের মধ্যে ভিক্ষায় পার্থক্য আছে। সেখানে (হরিদ্বার ও হৃষীকেশ) সাধু সেবার জন্য ধর্মপ্রাণ দানশীল ব্যক্তিগণ সত্র খুলিয়া খাদ্যাদি দানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। সাধুরা দল বাঁধিয়া সেখানে যায় আর খাওয়ার নিয়া আসে। সেখানে সাধু সমাজের ভিক্ষা করিয়া খাওয়াই প্রচলিত রীতি এবং তাহা সাধারণের নিকট হইতে নয়, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে—যেখানে সাধুসেবার জন্য লোক অর্থ দিয়াছে এবং যাহার উপর সাধুদের দাবী বা অধিকার আছে। আর এখানে কাহারও উপর কোন দাবী বা অধিকার নাই, অপরিচিত লোকের নিকট হইতে—যাহারা আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই এবং কোন কিছু জানে না, বুঝে না বা দান করিতে অভ্যস্ত নয়—তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ চাহিয়া আনিতে হইবে। কেহ কেহ হয়তো গালি দিয়া অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এই সমস্ত সহ্য করিয়া ভিক্ষা করিতে পারিবে? আমি তখন জানাইলাম—আপনি আদেশ করিলে কেন পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। তাহার পরই আমাকে ও মধুকে খুলনা সহরে পাঠাইলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য।"

তাহার পর আলোচনায় জানিলাম—শ্রীযুক্ত কুমুদদা' ও মধুদা মাদারীপুর ষ্টীমার হইতে খুলনায় নামিলেন। কোথায় যাইবেন বা থাকিবেন কোন কিছু ঠিক নাই। কাহারও নিকট কোন পরিচয়-পত্রও নাই। একটু অগ্রসর হইয়া থাকিবার স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্বেত উত্তরীয় ও বহির্বাস পরিহিত, নগ্ন পদ, মুণ্ডিত মস্তক, বৈরাগ্যদীপ্ত সংযমপূত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেরই অন্তরে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তাহারা আগ্রহ সহকারে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—আপনাদের আশ্রম যখন ফরিদপুর জেলায় এবং আপনারাও ফরিদপুরের লোক তখন নগেন সেনের বাসায়ই যান। তিনি শ্রেষ্ঠ উকীল, ফরিদপুরের লোক, ফরিদপুরের লোকদের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদ ও মধু সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নগেন বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত কুমুদ বলিলেন—আমরা বাজিতপুর আশ্রমের ব্রহ্মচারী। তখন নগেন বাবু প্রশ্ন করিলেন—ব্রহ্মচারী কাকে বলে? উত্তরে কুমুদ জানাইলেন—যে বীর্য্য ধারণের জন্য চেষ্টা বা সাধনা করে তাহাকেই ব্রহ্মচারী বলে। তাহার পর বাজিতপুর আশ্রমের সাধারণ কার্য্যাবলী এবং শ্রীমদাচার্য্যদের সম্বন্ধে আলোচনান্তে নগেন বাবু তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে নগেন বাবুর মাধ্যমে উকীল ও মোক্তার লাইব্রেরীতে শ্রেষ্ঠ উকীল মোক্তারদের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। (এই সময়ে) সহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের বাসায় একটি কলেজের ছাত্রের টাইফয়েড্। সেবা-শুশ্রূষার লোক নাই। তখন এই ব্রহ্মচারীদের সম্বন্ধে লাইব্রেরীতে আলোচনা হইল। নগেন বাবুর অনুরোধে দুই জনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত দিনরাত্রি প্রাণমন ঢালিয়া তাঁহারা সেবারত। আহার, নিদ্রা, বিরাম, বিশ্রামের দিকে পর্য্যন্ত খেয়াল নাই। মানুষ যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মত মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেবা করিয়া যাইতে পারে তাহা কাহারও ধারণা ছিল না। সমস্ত সহরে ধন্য ধন্য রব উঠিল। সকলের মুখে এক কথা—কোথা হইতে যেন দুই দেবদূত আসিয়া জ্যোতিষ বাবুর বাসায় রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সদ্ব্যক্তিরা তাঁহাদের দেখিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিলেন।

রোগী বাঁচিল না। কিন্তু সঙ্ঘের ভিত্তি খুলনাবাসীর অন্তরে চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্মচারীদ্বয়ের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর বাড়ীতে। নগেন বাবুর সঙ্গে জ্যোতিষ বাবুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ইহা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের কথা।

কিছু দিনের মধ্যেই স্থানীয় ধর্মসভায় অস্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে সকলেই আশ্রমের প্রাণপুরুষ শ্রীমদাচার্য্যদেবকে দর্শন করিতে চান। শ্রীযুক্ত কুমুদ বাজিপুর আসিয়া সমস্ত বিষয় আচার্য্যদেবের চরণে নিবেদন করিলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে আচার্য্যদেব খুলনায় উপস্থিত হইলেন। সহরের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে প্রত্যেকে ব্রহ্মচারীদের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীযুত মধু স্থানান্তরিত হইলেন। শ্রীযুক্ত কুমুদের উপর সমস্ত চাপ পড়িল। আমি এই সময় তাঁহার দিনচর্য্যা সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন—

"এক সময় হিমালয়ের পাদদেশে গভীর অরণ্যে সমস্ত দিন-রাত্রি নীরব সাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে। নিতান্ত ক্লান্ত হইলে স্বাধ্যায়ে মনোনিবেশ করিয়াছি। সাধুদের সঙ্গেও কথা বলি নাই। ভিক্ষার জন্য সত্রে যাতায়াত ও আহারের সময় ব্যতীত নিজ কুঠিয়ায়ই অবস্থান করিয়াছি। আর এখন সমস্তই তাহার বিপরীত; যে রাত্রিতে হাসপাতালে বা কাহারও বাড়ীতে রোগী শুশ্রূষার জন্য যাইতে না হয় সেই দিন রাত্রি ১১টা হইতে ৩টা—এই ৪ ঘণ্টা সময় আমার নিজস্ব। এই সময়টুকুই বিশ্রাম ও সাধনার জন্য পাই। যে দিন রোগী শুশ্রূষা থাকে সেই দিন তাহাও পাই না।"

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে শ্রীযুক্ত কুমুদ দা'র মুখের দিকে তাকাইলাম। তখনই তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ভোর ৫টা, বৈকাল ৫টা ও রাত্রি ১০ টায় খুলনা স্টেশন হইতে তিন খানি ট্রেন কলিকাতায় এবং সকাল ৬ টায় খুলনার ঘাট হইতে বরিশাল, বোয়ালমারী, মাদারিপুর ও সাতক্ষিরায় ৪ খানা ও সন্ধ্যায় মাদারিপুর ও বরিশালে দুইখানা ষ্টীমার যায়। এই ট্রেন ও ষ্টীমারগুলিতে যাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা ভিক্ষা করিতে হয়। হাতে একটি বাক্স থাকে, সেইটি সকলের নিকট ধরিলে যাহার যাহা কিছু দেওয়ার দেয়, আবার অনেকে তিরস্কার ভর্ৎসনাও করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুসকিল হয় পরিচিত লোকদের সহিত দেখা হইলে। তাহারা পূর্ব্বাশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে—তুমি আমাদের গৌরবের পাত্র, আমরা কত আশা করিয়াছিলাম—তুমি বড় বিদ্বান হইবে, বড় চাকুরী করিবে, আমরা তোমাকে নিয়া গর্ব করিব। আর আজ কিনা তোমাকে ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে দেখিতে হইল! তোমার মত বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলের এইরূপ বুদ্ধি-বিকৃতি হইল কেন?* তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া যাই।

প্রাতঃকালে ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বাসায় বাসায় এবং দ্বিপ্রহরে ১টা হইতে ৩টা ৩॥টা পর্য্যন্ত অফিসের মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিতে হয়। রবিবার দিন সকাল হইতে বেলা ১টা ১॥টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বাসা হইতে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের কাজও আছে। প্রায় রাত্রিতেই রোগী-শুশ্রূষার জন্য কখনও হাসপাতালে, কখনও বা লোকের বাড়ীতে যাইতে হয়। ভোরে সেখান হইতে ষ্টেশনে যাই।

আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জানাইলেন—"ইহারই মধ্যে এক ফাঁকে সিদ্ধভাত রান্না করিয়া লই। রাত্রির জন্য সকালেই কিছু ভাতে জল দিয়া রাখি। হরিদ্বার—হৃষীকেশের সত্রাপেক্ষা এই খাওয়ার অনেক ভাল।"

বেলা প্রায় চারিটা বাজে। রৌদ্রের তেজ কিছুটা কমিয়াছে। একাকী নৌকা বাহিয়া প্রায় ৪ মাইল পথ যাইতে হইবে। সুতরাং, সেখান হইতে উঠিয়া শ্রীমদাচার্য্যদেবের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা জানাইলাম।

যুগাচার্য্যসঙ্গ ও উপদেশামৃত—২৫৯-৬৬ পৃষ্ঠা

---

* শ্রীযুক্ত কুমুদ ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসে, প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কলেজজীবনেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

যুগাচার্যপরিকর পূজ্য বড় স্বামীজী : জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে

স্বামী বিকাশানন্দ

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—গীতা ২।২৭

যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। যার মৃত্যু আছে তার জন্ম অবশ্যম্ভাবী। যতদিন আত্মতত্ত্বোপলব্ধি না হয়, মোক্ষলাভ না ঘটে, ততদিন এই জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন ঘটতেই থাকে। যাঁরা কঠোর তপস্বী, বিধাতৃনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁদেরও দেহাবসান হয়ে থাকে। এমন কি স্বয়ং ভগবান্ যখন নরদেহধারণপূর্বক জগৎকল্যাণে আবির্ভূত হন তখন তিনিও এই নিজ বিধানের অনুসরণ ক'রে থাকেন। তিনি নিজের বিধানের অমর্যাদা নিজে করবেন কেন?

যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হন সৃষ্টির ভিতর জমে উঠা মল পরিষ্করণে। একটা মেসিন যেমন চলতে চলতে তাতে ময়লা এবং তার আমূল সাফাইয়ের প্রয়োজন হয়, তেমনি সৃষ্টিযন্ত্রের পরিষ্করণ না হলে তাও অচল হয়ে উঠার সম্ভাবনা। শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে উদ্ভূত মধুকৈটভ দৈত্যের সংহার এজন্যই আবশ্যক হয়েছিল। ওরা যে সৃষ্টিবিধাতা ব্রহ্মাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণাদি অবতার পুরুষ ধর্মগ্লানি নিরাকরণপূর্বক সনাতন ধর্মের পুনসংস্থাপনের কর্মের অবসানে নরশরীর পরিহার ক'রে স্বধামে প্রয়াণ করেন। সাধারণ জীবের জন্ম ও মৃত্যু কর্মফল ভোগের জন্য, আর ঈশ্বর-পুরুষের জন্ম ও তাঁদের মৃত্যু একই পর্য্যায়ের নয়, শরীরত্যাগ বিশ্বকল্যাণের প্রয়োজনবোধে। তাঁদের দেহধারণ ও দেহাবসান—দিব্য।

সম্প্রতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দজী মহারাজ তাঁর দীর্ঘ সাধন ও নিষ্কাম কর্মময় জীবনের অবসানে শ্রীগুরুচরণে লীন হলেন। তিনি ছিলেন যুগাবতার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আবাল্য লীলাসহচর। যুগপুরুষ স্বকর্ম সাধনের জন্য যে সকল লীলাপার্ষদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের ভিতরে কেবল অন্যতম নহেন—প্রধানতম। সংসারের আবিলতা স্পর্শের পূর্বেই কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই ভাগবত পুরুষের সংস্পর্শে আসেন এবং সহজাত বৃত্তির প্রভাবেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য জাগ্রত হয়। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে প্রবেশ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগপূর্বক তপস্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে। অতঃপর আচার্য্যদেবের দুর্বার আকর্ষণে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফিরে আসেন তাঁর শ্রীচরণে। সে সময় থেকেই আচার্য্যদেব-প্রবর্ত্তিত মানবকল্যাণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তিনি। সঙ্ঘগঠনের প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি অতঃপর সঙ্ঘাচার্য্যের মহাপরিনির্বাণের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সভাপতির বরণীয় পদে অধিষ্ঠিত হন।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ডঃ ডি. ডি. মেহতা [M. A LL B, Ph.D (Astrology). B.H.U. (1955)] পূজ্য স্বামীজীর জন্মকোষ্ঠী বিচার করেছেন। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের পারিবারিক সূত্র থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত জন্মঠিকুজীর * ভিত্তিতে পর্য্যালোচনা ক'রে শ্রীমেহতা মত প্রকাশ করেছেন এই ঠিকুজী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশিষ্টধর্মী (one of the most outstanding Charts, Specially on the spiritual field) তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় কর্মক্ষয়ের জন্য জীবন ধারণ করেন নি। শ্রীগুরু-প্রদত্ত বিশ্বকল্যাণ-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গের জন্যই তাঁর শুভজন্ম। ধর্মস্থানে নবম পতির স্বামী শনি স্বগৃহে দৃষ্টি করায় তাঁকে অনুভবপরায়ণ সিদ্ধাত্মায় স্থাপন করেছে। বুধের গৃহে মিথুনে মঙ্গলের অবস্থান তাঁকে করেছে সর্বধর্মের প্রতি উদার। নবম গৃহে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় তিনি স্নেহপরায়ণ ও সমদর্শী। ধর্ম ও ভক্তির নবম স্থানে গুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকাতেই তিনি আবাল্য গুরুগত-প্রাণ। স্বপনে ও জাগরণে সর্বক্ষণ শ্রীগুরুই তাঁর ধ্যেয় ও মননীয়।

---

* সৌর ফাল্গুনস্য দশম দিবসে কুজবাসরে শুক্লপক্ষীয় একাদশ্যাং তিথৌ শুভমীন উদয়ে পুনর্বসু নক্ষত্রাশ্রিত-মিথুন-রাশৌ চন্দ্রে, ১৮২০ শকাব্দাঃ।

তিনি যা কিছু শিক্ষা দেন, যা কিছু বলেন সমস্তই গুরুশরণা-গতির নিষ্ঠায় পূর্ণ। শনির প্রভাবে তিনি ত্যাগব্রতী-সন্ন্যাসী।

সভাপতিরূপে স্বামীজীর কার্য্যকালে সঙ্ঘ দেশে ও বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। যারাই তাঁর পূত সংস্পর্শে এসেছে তারা সকলেই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে মুগ্ধ এবং সঙ্ঘের জনহিতকর কার্য্যে অনুরক্ত হয়েছে।

তিরোভাবের পূর্বে দুই বৎসরাধিক কাল তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে অন্তর্লীন হয়ে স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন ; প্রয়োজনে স্থূল জগতে অবতরণ করে অর্দ্ধবাহ্য দশায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে সঙ্ঘের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিতেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের ন্যস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত অবহিত ছিলেন। দর্শনার্থীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের সুযোগ পেত। যদিও তিনি মুখে কিছু বলতেন না, তথাপি দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের মুখে শুনেছি, তারা যে প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হতো মহাপুরুষের স্পর্শ ও আশীর্বাদেই তার উত্তর বা সমাধান আপনি পেয়ে যেতো।

সর্বনিয়ন্তা নিজ কার্য্য সাধনের জন্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, পবিত্র আত্মাকে তপোলোক থেকে আকর্ষণ ক'রে আনেন। পূজ্য-পাদ স্বামীজী তেমনি এক শুদ্ধ, বুদ্ধ মহাপুরুষ। এই অমর আত্মার মৃত্যু নেই।

হে মহাপ্রাণ, লহ প্রণাম !

স্বামী সচ্চিদানন্দ ঃ এ মহাজীবন ছিল সচল ত্রিবেণীতীর্থ

স্বামী বুদ্ধানন্দ

পাঞ্চভৌতিক দেহের সীমায়িত আবরণের ঊর্দ্ধে আজ তিনি। অসীমে অনন্তে আজ তিনি মিলে মিশে রইলেন। শ্রীগুরুর মহাভাবে ভাবিত মহাপ্রাণ আজ আনন্দলোকে। তাঁর আশীর্বাদ আনন্দলোক হতেই ঝরে পড়ুক মৃত্যুলোকে অমৃতের বার্তা নিয়ে বারে বারে।

কাশীর পূজার পূর্বেই তো তাঁর একান্ত সেবককে বলেছিলেন,—"যোগানন্দ স্বামীজীকে বল, যেখানে যেখানে যা যা সই করতে হবে, করিয়ে নিক। এমন কথা বেশ বারে বারেই বলেছেন। কিছুদিন হ'তেই মাঝে মাঝে বলতেন, "অনেক দিন আসা হয়েছে, এখন যাই।"

যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনে যুগদেবতারূপে যখন শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন, সঙ্গে নিয়ে আসেন মুক্তাত্মা দেব-পুরুষদের তাঁর লীলা-সহচররূপে। রামায়ণ, মহাভারতের সেই পুরাতনী কথা আবার যেন সত্য হয়ে নবরূপে চিত্রিত হলো সঙ্ঘের এই মহিমান্বিত সন্তানদের জীবনে।

এমনি স্বভাবে যোগস্থ, জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আর সঙ্ঘকর্মের মত ব্যস্ততার মাঝেও ফল্গুধারার ন্যায় বয়ে চলেছে সাথে সাথে সেই অন্তর্লীন ভাবটি। শ্রীগুরুনির্দ্দেশ প্রথমাবধিই ছিল তাঁর প্রতি—

"এমনি অবস্থায় সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করিবে যেমন বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি-সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে লইতে পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক বৈরাগ্যলাভ হইতে থাকিবে।"

শেষের ক'টি বছর আত্মস্থ এ মহাভাবটি অন্তরের মণিকোঠা ছেড়ে বাইরের দৈনন্দিন ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলো সর্বভাবে। খাওয়া-পরায়, দেখা-শুনায়, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বাবস্থায়ই যেন ভাবান্তর। এ

আত্মস্থ ভাবটিই পরম আত্মায় চিরতরে স্থির হয়ে গেল সেদিন।

ইংরাজী বছরের প্রথম মাসটিতেই শুক্লপক্ষের অমৃত-যোগে সন্ধ্যারতির শেষে শ্রীগুরুপূজার চরণামৃত পান করে, রাত্রি ৮-১০ মিঃ স্বামী সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ, আনন্দে মিলিয়ে গেলেন। ১৯৪১ সালের ৮ই জানুয়ারীর শিবগুরু স্বামী প্রণবানন্দের লীলাবসানের দিনটির সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল রেখেই স্বামী সচ্চিদানন্দের এ মহাপ্রয়াণ।

মাদারিপুর মহকুমার কলাগাছিয়া গ্রামের স্বচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের বৈরাগ্যসুন্দর সপ্রতিভ ছাত্র কুমুদ মৈত্র বাজিত-পুরের রাজকুমার এডওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে যেদিন উচু শ্রেণীর বিদ্যার্থী সাধু বিনোদের সান্নিধ্যে আসেন, সেদিন থেকেই জহুরী যেমন জহর চিনে তেমনিই প্রাণারাম দেবতা তাঁকে চিহ্নিত লীলাপার্ষদরূপে চিনে নেন। সাধু বিনোদই আত্মপ্রকাশ করেন পরে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দরূপে, আর কুমুদ পরিচিত হন তাঁরই প্রথম প্রধান শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দরূপে।

বাজিতপুরের ছাত্রজীবনের পর কোলকাতার সেণ্টাল কলেজ, কাশীর মঠে, গঙ্গার ঘাটে, হিমালয়তীর্থ হৃষিকেশের স্বর্গাশ্রমে ক'টি বছর কেটে গেল। দূরে নিকটে, নানা অবস্থান্তরে, নানা পরীক্ষায় কুমুদের উর্দ্ধমুখী ভাবরাজি আরও পুষ্ট, আরও স্থির, আরও তন্মুখী হলো।

এবার শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁর কাছে, তাঁর কাজে কুমুদকে একেবারে টেনে নিলেন। ইং ১৯২৪ সালে বাজিতপুরের সিদ্ধপীঠে ত্যাগব্রতে মহাদীক্ষা গ্রহণ করলেন তিনি। সে এক মহামাহেন্দ্রক্ষণ। সম্মুখে বেদমন্ত্রে প্রজ্জ্বলিত পূত হোমানল শিখা। উর্দ্ধগগনে আলোকদূত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা। শান্ত গম্ভীর নাদে শ্রীগুরু বিশ্বনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মহামুক্তি-মন্ত্র। মুহূর্ত্তের তরে যেন শান্ত হলো বিশ্ব প্রকৃতি, ক্ষণের তরে স্তব্ধ হলো সব কল-কোলাহল। জন্ম-জন্মান্তরের সব বাসনারাশি নিমেষে নিঃশেষ হলো। শ্রীগুরু-করুণার মহামুক্তি-সরোবরে কুমুদ-কলি বিকশিত হলো শতদলে নবরূপে নবনামে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর যুগদেবতার ধর্ম ও কর্মচক্রের অনুবর্ত্তনে সহসাথীদের নিয়ে এবার তার গতি হল বিরাম-হীন, অতন্দ্র।......সঙ্ঘের জন্মলগ্ন হতেই এ মহাসঙ্ঘের সহ-সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাব-সানের পর ইং ১৯৪১ সালে সঙ্ঘ-সভাপতিরূপে বৃত হলেন অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মিত সঙ্ঘরূপ বিরাটহর্ম্যে, তিনি ছিলেন প্রধানতম স্তম্ভ। শ্রীগুরুগতপ্রাণ সে মহাপ্রাণ ছিলেন অধ্যাত্মজগতের পথিকৃৎ। জ্ঞান-বৈরাগ্যপূত তাঁর মহাজীবন ছিল চির উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। সন্ন্যাসের গাম্ভীর্য্য, মানবতার ঔদার্য্য, ব্যক্তিত্বের বিশালতা আর সেবকের দীনতা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় নানা নদীধারার ন্যায়ই তাঁর মহাজীবন-সাগরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—"তুমি হবে সঙ্ঘের মা"। সত্যি তিনি সঙ্ঘের মা-ই ছিলেন। মমতাভরা প্রাণ নিয়ে সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন সর্বজনের পরম আপন। তাঁরই স্নেহ পক্ষপুটে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা আর সহস্র সহস্র মানুষ লালিত পালিত হয়েছে আকণ্ঠ তাঁর স্নেহরস পান করে। সস্নেহ শাসন আর বর্ণময় ভালবাসায় সে মাতৃত্বের ভূমিকা ছিল মহান্ শান্তির পরম মধুময়। তাই তাঁর অদর্শনে আজ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় নারী-নর, বালবৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই কেঁদে পাগলপারা।

শঙ্করাচার্য্যের বিবেক-বৈরাগ্য, বুদ্ধের ত্যাগ ও চৈতন্যের প্রেম—এ তিনটি পুণ্যধারার সম্মিলনে স্বামী সচ্চিদানন্দের পূত জীবন ছিল সচল ত্রিবেণী-তীর্থ।

যখন ভাববিভোর হয়ে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী থেকে তিনি "দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়ত, কালঃ-ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-স্তদপি ন মুঞ্চতি আশাবয়ুঃ ভজ-গোবিন্দম্, ভজগোবিন্দম্, ভজগোবিন্দম্ মূঢ়মতে"...... ইত্যাদি পড়তেন আর পড়াতেন, এর মর্মার্থ শুনতেন আর শুনাতেন, তখন অপরূপ দিব্যভাবে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে যেতো! কি মগ্ন হয়েই না তিনি গাইতেন—"মন তুমি কি চিরজীবী! দিন কি তোমার এমনি যাবে, দেহপিঞ্জর, হ'লে ভঙ্গ প্রাণবিহঙ্গ পলাইবে" অথবা "এ মায়াপ্রপঞ্চময় ভবরঙ্গ-মঞ্চ মাঝে রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই

সাজে"-এ গানগুলো! আচারে-আচরণে, অশনে-ব্যসনে তাঁর সহজ বৈরাগ্যময় জীবন সন্ন্যাসী, যোগী বিরক্ত পুরুষ আর সাধকদের চিরদিনের আদর্শ হ'য়ে থাকবে।

শ্রীবুদ্ধের জীবনে দেখি ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে তীব্র সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে। মৃত, পীড়িত, বৃদ্ধ আর সন্ন্যাসীকে দেখে ঘটনা-সংঘাতে তথাগতের জীবনে বৈরাগ্য জাগে। মারের সঙ্গে সংগ্রাম করে আর সঙ্কল্পে দৃঢ়তা রেখে সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ। স্বামী সচ্চিদানন্দের জীবনে ত্যাগের প্রতিষ্ঠা অত আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলেনি। নানা-স্তরে কিছু কাঠিন্য ছিল সত্য কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্যসাধনা এবং তা যেন জন্মগত। তাঁর জীবনাকাশ প্রথমাবধিই ছিল মায়ামোহের মেঘমুক্ত। শ্রীগুরুকৃপার সূর্য্যালোকে তা একদিন আলোক-ময় হয়ে উঠলো অন্তরে বাইরে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ন্যায়ই ভাগবতপ্রেমে তথা শ্রীগুরু-প্রেমে তিনি ছিলেন মাতোয়ারা, শয়নে-স্বপনে, ধ্যানে-জ্ঞানে, প্রতিবাক্যে, প্রতিকার্য্যে সর্বদাই শ্রীগুরুভাবে মগ্ন তিনি। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ন্যায় স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রেমের ধারাও দুইটি বিশেষ খাতেই সদা প্রবাহিত হতো।

ভাগবতপ্রেম আর আচণ্ডালে প্রেম তাঁর কাছে ছিল একই। তাইতো দেখি, মৎস্যব্যবসায়ী সমর কাছে এলে তাকে আরও কাছে টেনে নেন, মৌড়লা মাছের গল্প করেন, তার আয়ের কথা ভাবেন, সংসার চলে কেমন করে জিজ্ঞেস করেন, হ'য়ে যান তার পরিবারের একান্ত আপনজন। তাই, ৮ই জানুয়ারীর সেই মহাসমাধিতে শায়িত তার প্রাণ-দেবতাকে দেখে সহস্র সহস্র শোকার্ত্ত মানুষের মাঝে সমর গগনভেদী আর্ত্তনাদে কেঁদে কেঁদে মেঝের ধূলায় গড়াগড়ি যায়।

কোলকাতায় রবীন্দ্র-সরোবরের ধারে লিলিপুল পার্কে প্রাতঃ ভ্রমণকালে দেখি, পার্কের মালী, শান্তি, ভিকু, নটেন মাপুয়া, ইস্রা, কমল বাহাদুর, চোঙ্গা ওরাং আরও অনেকে এবং ওদের ছেলেপুলেদের হাতে প্রসাদ দিচ্ছেন তাদের বাবা, তাদের মহাত্মাজী। তাদের সংসারের সুখ দুঃখের খবর নিচ্ছেন, মাথায় হাত দিয়ে বারে বারে অভয় আশ্বাস আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন।

ঝাড়গ্রাম পুকুরিয়ার গ্রামাঞ্চলে দেখি সমাজের দরিদ্রতম অবহেলিত লোধা-সাঁওতাল মেয়ে পুরুষেরা তাঁকে দেখে দু' হাত তুলে মনের আনন্দে বলে উঠছে, আমাদের ভগবান্ এসেছেরে, আমাদের ভগবান্ এসেছে।

পতিত, দলিত, ব্যথিত, আর্ত্তের মাঝে আর বন্যায় দুর্ভিক্ষে, নানা আপদে বিপদে সঙ্ঘের মানবসেবার মহান্ কর্মে দীনের দেবতা এ মহামানবের আদর্শ ও আশীর্বাদ চিরদিন প্রেরণা যোগাবে।

বাজিতপুর সিদ্ধপীঠ ইং ১৯৩৫ কি ৩৬ সালের কথা জনৈক স্বামীজী তখন ব্রহ্মচারী ননী। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ তাঁকে বল্লেন—"দেখ, ঐ যে স্বামীজীকে দেখছিস, শরীরে কোনও চাকচিক্য নাই, চোখ দুইটি যেন কোটরাগত, জামা কাপড়ে কোনও চোখ ঝল্‌সানো রং চং নাই, অল্প অল্প কথা বলেন, সকলের পেছনে থাকেন, সব কাজ করেন—উনি এই সঙ্ঘের খুব বড় সাধক"। ঠিক এমনি কথা। সম্ভবতঃ ইং ১৯৪২ সাল। স্বামী কৃষ্ণানন্দজী সেবক সত্যেনকে বল্লেন—ঐ যে দ্যাখ, কোণে দাড়িয়ে আছেন—সবার পেছনে, সবার আড়ালে, উনিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি।"

আত্মপ্রতিষ্ঠায় মত্ত মানুষ যে যুগে বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় কেবলি ভূমণ্ডল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে যুগেই স্বামী সচ্চিদা-নন্দজী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ন্যায় মহাসঙ্ঘের শীর্ষদেশে থেকেও একান্তভাবেই ছিলেন আত্মপ্রচারে বিমুখ। সঙ্ঘ-দেবতার প্রতিষ্ঠা আর সঙ্ঘের প্রচার-প্রসারের মাঝেই ছিল তাঁর আত্মতৃপ্তি, তাঁর সুদীর্ঘ সভাপতিত্বকালেই সঙ্ঘ দিকে দিকে, দেশে-বিদেশে, শাখা-প্রশাখায়, নানাভাবে নানারূপে প্রচারিত, প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত হলো। বহুর মাঝে নিজেকে পাওয়ার সাধনাই তো ভারতের শাশ্বত সাধনা। স্বামী সচ্চিদানন্দ ছিলেন সে সাধনায় সিদ্ধযোগী, সে সাধনার মূর্ত প্রতীক।

হিন্দু সমাজের নবজাগরণে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে, ভারত-সংস্কৃতির সম্প্রসারণে মানব সেবাব্রতে তাঁর আলো-কিত জীবনের অম্লান স্নিগ্ধজ্যোতিঃ আমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের পথে নিয়ে যাক্—এই প্রার্থনা।

এক অনির্বাণ শিখা

তিনটি ছবি। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন—কিন্তু পরপর সাজালে তাতেই ধরা পড়ে এক মহাজীবনের ব্যাপ্তি।

১৯২০ সাল। বাজিতপুর সেবাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমুদ এবং মধু নামে দুজন সেবককর্মী এসেছেন খুলনায় এসে তাঁরা শুনলেন, সেখানকার উকিল জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গৃহশিক্ষক তাঁর বাড়িতে, অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে দেখার কেউ নেই। কথাটা শুনেই কুমুদ তাঁর সঙ্গী মধুকে নিয়ে লেগে গেলেন সেই ব্যক্তির সেবায়। কিছুদিন পরেই মারা গেলেন সেই ব্যক্তি। জ্যোতিষবাবু কিন্তু মুগ্ধ হলেন কুমুদ-দের অক্লান্ত সেবা আর বৈরাগ্য দেখে। তিনি নিজেই তখন শহরের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সংগৃহীত হল সেবাশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

দ্বিতীয় ছবি ১৯৩০/৩৫ সালের। কলকাতার বালীগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ তখন রয়েছেন সেখানেই। কুমুদ তখন সঙ্ঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী কর্মী। ত্যাগ ও সেবায় অক্লান্ত। পুরীতে সঙ্ঘের কাজ করে সারা রাত ট্রেণে জেগে সেদিনই এসে পৌঁছেছেন আশ্রমে। স্নান শেষে বসেছেন গুরুদেবের চরণতলে তাঁর আদেশের অপেক্ষায়। স্বামী প্রণবানন্দ কিন্তু নির্বিকার। তিনি করে যাচ্ছেন তাঁর কাজ। অদ্ভুত সন্তানটির দিকে তাঁর যেন নজরই নেই। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তখন সন্ন্যাসী কুমুদকে বলছেন আহার করে নেবার জন্য। কিন্তু গুরু যেমন নির্বিকার-শিষ্যও তেমনি। গুরুর আদেশ ছাড়া তো তিনি গ্রহণ করতে পারেন না কিছুই। তাই যেমন ছিলেন তেমনিই বসে থাকেন। আচার্য প্রণবানন্দ লক্ষ্য করেন সব কিন্তু বলেন না কিছুই। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যখন আচার্যের অন্তরঙ্গ ওই সন্ন্যাসীটিকে বারবার আহার করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন তখন অকস্মাৎ-ই আচার্য যেন গর্জে ওঠেন। বলেন, দু-একদিন না খেলে কি হয়? ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক দু-তিন দিন অন্তর অন্তর একদিন খেতে পায়। সেই বুভুক্ষু ভারতে দু-এক বেলা না খেলে কিছু হয় না। আচার্যের সে কথায় সবাই নীরব। কিছু পরেই তিনি অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসীটিকে আহার করতে বললেন। কিন্তু তার আগে ত্যাগ, ধৈর্য ও তিতিক্ষা পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে করে তুললেন আরো সংযমী, আরও কঠোর—ভারতের করুণচিত্র তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন আরো বাস্তবভাবে। আর সন্ন্যাসী কুমুদও আচার্যের অভীপ্সা বুঝে নীরবে সেই আদর্শকে দৃঢ় করে ধরলেন।

তৃতীয় ছবি বারাণসীর। কাশীতে নিজস্ব জমিতে তৈরি হচ্ছে সংঘের নিজস্ব আশ্রম। যে জমিতে আশ্রম হবে তার মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর। আচার্য প্রণবানন্দের নির্দেশে সেই পুকুর ভরাটের কাজ তদারকি করছেন সন্ন্যাসী কুমুদ। বারাণসীর গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ড তাপের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তিনি করাচ্ছেন কাজ। মাথায় তাঁর একটি ছেঁড়া ছাতা। গাধার পিঠে করে আসছে বালি। সেই তপ্ত বালি উঠে এসে লাগছে গায়। তিনি কিন্তু নির্বিকার। একমনে গুরুর আদেশে করিয়ে যাচ্ছেন কাজ। তাঁর অন্তর তখন গুরুচরণগত—বাইরের ইন্দ্রিয় গুরুর নির্দেশিত কাজে সক্রিয়।

তিনটি ছবির এই কুমুদই হলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সদ্যপ্রয়াত সংঘগুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ। ফরিদপুর জেলার কলিয়াগাছিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল তাঁর কুমুদবিহারী মৈত্র। ১৯২০ সাল নাগাদ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি আসেন স্বামী প্রণবানন্দর সংস্পর্শে। আচার্য সেদিন চিনে নিয়েছিলেন তাঁর উত্তরসূরীকে। তাই আর সবার থেকে আলাদা করে তিনি তাঁকে দিতেন শিক্ষা। তাঁর বৈরাগ্যে-ভরা হৃদয়কে করে তোলেন আরো বৈরাগ্যময়। তাঁরই পরিণতিতে কুমুদবিহারী স্বামী প্রণবানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে হন স্বামী সচ্চিদানন্দ। ধর্ম এবং কর্ম-কে জীবনের ব্রত করে এগিয়ে যান তিনি জীবনের পথে। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে তিনি যেমন করেছেন আত্মমুক্তির সাধনা তেমনি দেশের দুর্গতময় অঞ্চলে-প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়েও করেছেন

দুর্গতদের সেবা। তাঁর সাধনার এই দ্বিমুখী রূপ দেখে মানুষ ভক্তিনম্র অন্তরে অবনত হয়েছে তাঁর পায়ে। গুরু-নির্দেশিত পথে গুরুর বাক্যে প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা রেখে করে গেছেন কাজ। অধ্যাত্মসাধনায় দুর্গতদের সাধনায় ঋদ্ধি ও সিদ্ধি ছিল তাঁর করতলগত—সেই স্বামী সচ্চিদানন্দ দীনের থেকে দীনের কাছেও গেছেন নিরহঙ্কার হয়ে—কাছে টেনে নিয়ে নিয়েছেন তাঁদের। ১৯৪১ সালের ৮ জানুয়ারি স্বামী প্রণবানন্দের দেহত্যাগের পর সংঘের দ্বিতীয় সভাপতি রূপে তিনি মাথায় তুলে নেন কর্মভার আর সে কর্মযজ্ঞ সমাপণ করে ১৯৮৯ সালের সেই ৮ জানুয়ারিই তিনি লীন হলেন গুরুর চরণে। এ কি নিছকই একটি সাদৃশ্য—গুরুর অফুরন্ত করুণায় শিষ্যকে নিষ্ণাত করার এ এক মহান্ অনন্য মুহূর্ত। ঘটনা যাই হোক তাঁর আদর্শের অগ্নিশিখা সংঘের মধ্যে থাকবে অনিবার—অনির্বাণ।—পরিব্রাজক

[যুগান্তরের সৌজন্যে]

পূজ্য বড় স্বামীজীর সম্বন্ধে টুক্‌রো কথা

(প্রণব-সম্পাদকের পুরাণো ডায়েরি)

শ্রীগুরুর আজ্ঞাধীন অক্লান্ত কর্ম্মী

কাশীধামে সঙ্ঘের প্রস্তাবিত নূতন আশ্রমের জমি ভরাটের কাজ চলছে। খচ্চরের পীঠে মাটি আনা হচ্ছে। কাশীতে খচ্চরের দল ভার বহন করে। এই কাজের দেখাশুনা করছেন বড় স্বামীজী। স্বামী পরমানন্দজী একদা কথাপ্রসঙ্গে সেই বিষয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। বলেন—"আমি যেদিন দেখেছি যে কাশীধামের নূতন জমি ভরাট কালে স্বামী সচ্চিদানন্দজী প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে মাটি বহনকারী খচ্চরের দলের হিসাব রাখছেন, সেই দিনই বুঝেছি তিনি শ্রীগুরুর আজ্ঞাধীন কত বড় একনিষ্ঠ ও নিরলস কর্ম্মী। উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের তাপ যেন অগ্নিবর্ষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খর তাপ অগ্রাহ্য ক'রে বিল্ডিং এর কাজ দেখাশুনা করতেও তাঁকে দেখেছি। এই কর্ম্মের ভিতরই লক্ষ্য করেছি তাঁর কঠোর তপস্যা।"

নিরভিমান গুরুভক্ত

স্বামী পরমানন্দজী ব'লে চলেছেন। সে আর এক দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনা।

"২৪।৩, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়। একদিন শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব আমাকে বলেন—'সেলাই করতে জানিস? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ভাবে কাপড়ের দুটো মুখ একত্র ক'রে ধরবি, এইভাবে স্ুঁচের ফোঁড় তুলবি, তা হলেই সেলাই হয়ে যাবে।'

একটা ছেঁড়া সামিয়ানা সেলাইয়ের ভার পড়লো সেবকের উপর। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ শ্রীহস্তে শিখিয়ে দিলেন কাজটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়েছি, সেলাই করার কাজ তো শিখিনি। সাধুজীবনে সব কাজই শিখতে হয়, সব কাজই করতে হয়।

ছাদের উপরে সকালে সামিয়ানাটা বিছিয়ে নিয়ে সেলাই আরম্ভ করেছি—তেমনি ভাবে কাপড়ের দুমুখ এক ক'রে ফোঁড় তুলছি। দেখতে দেখতে ছাদে রোদ এসে গেল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রের তেজঃ হলো প্রখর থেকে প্রখরতর। ক্রমে দুঃসহ। আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। দ্বিপ্রহর এগিয়ে আসে। ও! অসহ্য!

সহসা ছাদে আসেন আচার্য্যদেব। কাজটা কত দূর এগুচ্ছে কি ভাবে হচ্ছে তা তো দেখবেনই, আর এই দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড তাপে সন্তানের কি কষ্ট হচ্ছে তাও দরদী পিতা প্রত্যক্ষ করবেন বৈকি। আমার কষ্ট দেখে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উপর আদেশ হয় আমার মাথায় ছাতা ধরতে। কিন্তু দু'তিন বার বলা সত্ত্বেও তিনি নীরব। সম্ভবতঃ অভিমানে

দ্বিধাগ্রস্ত। আমি যে Junior, আর তিনি Senior, বড় কি পারে ছোটর পরিচর্য্যা করতে? জানি না, এ অবস্থায় পড়লে আমার নিজের মনে কি প্রতিক্রিয়া হতো, নির্ব্বিচারে তাৎক্ষণিক উদ্যোগে এ কাজ করতে পারতাম কি না। কিন্তু একজন পারলেন।

উক্ত সন্ন্যাসীর অনীহায় আচার্য্যদেব মনে মনে রুষ্ট, তা বুঝতে পারলাম। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দজী ছাদে এসেছেন। আচার্য্যদেব তাঁকেই আদেশ করেন ছাতা ধরতে। তিনি আমাদের গুরু-ভ্রাতাদের ভিতর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখি, কিছু মাত্র না ভেবে, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় তিনি ছাতা খুলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, আমাকে দিলেন স্নিগ্ধ ছায়া। তিনি জানেন— শ্রীগুরুর আদিষ্ট সকল কাজই কর্ত্তব্য। এতে মান-অভিমানের প্রশ্ন নেই। সঙ্ঘের কার্য্যে যে প্রাণপাত করছে, এমন সেবক ছোটই হোক বা বড়ই হোক, তাঁকে সাহায্য করা সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতারই মহাপূজা।

পূজ্য স্বামীজীর গুরুভক্তি, গুরুগতপ্রাণতা, গুরুর আজ্ঞা-বহতা, তাঁর সঙ্ঘনিষ্ঠা ও সঙ্ঘভ্রাতাদের সেবার আগ্রহ দেখে সেদিন আমি অতিমাত্র অভিভূত। সকল সঙ্ঘ-সন্তানের শিরোমণিরূপে সেই দিনই আমি তাঁকে চিনেছি। মনে মনে জানিয়েছি সহস্র সশ্রদ্ধ প্রণতি।"

সেই ভিক্ষুকেরাই আজ বড় দাতা

উচ্চবংশের সন্তান, শিক্ষিত ও মেধাবী। কলেজের পড়া শেষ করে ডিগ্রি নিয়ে বড় চাকুরিয়া হতে পারতো, প্রচুর মান-সম্মানের অধিকারী হতো। সব ছেড়ে দিয়ে এলো বৈরাগীর দলে! ট্রেনে, ষ্টীমারে, পথে ঘাটে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে! গলায় দড়ি জুটলো না!—কি সুতীক্ষ্ণ বাক্যশেল!

সঙ্ঘের সেই আদিকালের কথা। খুলনায় নূতন আশ্রম হচ্ছে। পূজ্য স্বামী সচ্চিদানন্দজী ও পূজ্য স্বামী যোগানন্দজী ভিক্ষার বাক্স হাতে নিয়ে ট্রেণে ষ্টীমারে, পথে ঘাটে অর্থ সংগ্রহ করছেন। খুলনা বা কলকাতায় আসা-যাওয়ার পথে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা এক দৃশ্য দেখতেন, আর ছুঁড়ে দিতেন চোখা চোখা তিরস্কার। প্রসঙ্গটা তুলে স্বামী পরমা-নন্দজী মন্তব্য করেন—"আজ তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা দেখুন, সেই দিনকার সেই ভিক্ষুকেরাই হয়েছেন আজ বড় দাতা। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের সেবা করছেন— বিপদে ও বিপর্য্যয়ে, আর সংসারক্লিষ্ট মানুষকে দুহাতে বিতরণ করছেন আধ্যাত্মিক পরমামৃত"

ইনি কি idiot?

পূজ্য বড় স্বামীজীর ছাত্রজীবনের কথা শুনাচ্ছিলেন শ্রীমৎ আত্মানন্দজী। উভয়ে একই বংশের একই গ্রামের সন্তান পড়াশুনাও করেছেন একই গ্রামের স্কুলে। উত্তরকালে উভয়েই সঙ্ঘের প্রথম থাকের প্রণম্য কর্ণধার।

বাজিতপুর হাইস্কুলের তাৎকালিক প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য বাবা গম্ভীরনাথজীর গৃহস্থ মন্ত্রশিষ্য। বেশভূষায় তিনি ছিলেন বিশেষ মার্জ্জিত। বয়স তখন তাঁর ২৩,২৪। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী বা কোট-প্যান্ট পরে স্কুলে আসতেন, দেখতেও ছিলেন খুব সুপুরুষ।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের (তখন বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী বিনোদ) সান্নিধ্যে এসে পূজ্য বড় স্বামীজীও (কুমুদ) তখন বৈরাগ্য মূর্ত্তি। ছোট ছোট চুল ছাঁটা, তেল না মাখা, হাঁটুর নীচে খাটো কাপড় পরা, আর শীত ও গ্রীষ্মে একটা কোট পরে স্কুলে আসা, উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা—ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় কুমুদের এই চেহারা প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের পছন্দ নয়।

একদিন প্রধান শিক্ষক মহোদয় তিরস্কারের সুরে বলেন— "তুমি তো বনিয়াদী ঘরের ছেলে, পড়াশুনায়ও ভাল, কিন্তু ও-রকম idiot এর মত বেশভূষা কেন?" কথাটা কুমুদের (বড় স্বামীজী) মনে লাগে। তিনি তাঁর ভাবী গুরু আচার্য্যদেবের কাছে এসে সেই কথা বলেন। মহাপুরুষ শ্রীম লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থ থেকে একখানা চিত্র বা'র করেন। ঐটি শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধকগণের বৈরাগ্য-ভাবমণ্ডিত গ্রুফ ফটো। ছবি দেখিয়ে হেসে বলেন—"এরা কি সবাই idiot?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র ক'রে একদা এক আধ্যাত্মিক মহাভাবের প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল। তার পর এই বঙ্গভূমির মাটিতেই আর এক মহাপ্লাবন আসছে এবং শ্রীমান কুমুদেরা তার ধারক ও বাহক—এই সার্থক ইঙ্গিতই সেদিন আচার্য্য-কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল কি?

স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার

বর্ত্তমান রচনার এই অংশের বক্তা স্বয়ং পূজ্য বড় স্বামীজী। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা; স্থান—প্রধান কার্য্যালয়ে পূজ্য বড় স্বামীজীর বিশ্রাম-ভবন। উপস্থিত ছিলেন পূজ্য শ্রীমৎ যোগানন্দজী ও পূজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দজী সহ বর্ত্তমান প্রণব-সম্পাদক। তিনি যা বলেছিলেন তা আমার নিজের ভাষ্যে তুলে ধরছি।

বাজিতপুরের বিপিন মজুমদার পূজ্য বড় স্বামীজীর অন্যতম ভগ্নিপতি। বিপিন বাবুর পুত্র ক্ষীরোদ মজুমদার পরবর্তীকালে এড্‌ভোকেট হন। পূজ্য বড় স্বামীজী এই বাড়ী থেকেই বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তিনি গোপনে আসতেন সাধুর কাছে (আচার্য্যদেবের কাছে), যাতে বিপিন বাবু জানতে না পারেন। কিন্তু ভগ্নি তা জানতেন। বলতেন—"আমি জানি তুই কোথায় যাস্।" ভগ্নি বাধা দিতেন না এবং স্বামীর কাছেও প্রকাশ করতেন না। শ্রীমৎ যোগানন্দজী (তৎকালে মধু) আসতেন বিলাসখান থেকে ষ্টীমার যোগে চরমৃগুরিয়া থেকে হেঁটে বাজিতপুরে। কখনো কখনো মাতুলবাড়ী (কলাগাছিয়া) থেকেও আসতেন। সাধুর কাছে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে বিপিন বাবু না জানতে পারেন, সে বিষয়ে তিনিও ছিলেন সদা সতর্ক। একবার একাদশী দিন সাধু তাঁকে দুধ-খই খাওয়ান।

একদিনের কথা। সাধু তখন দ্বিতীয় বার গোরক্ষপুর থেকে বাজিতপুর ফিরে এসে কঠোরতর যোগসাধনে নিরত। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তদীয় ভবিষ্য সঙ্ঘগঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগও। কিন্তু সেটা তাঁর নিজের মনেই আছে, বাইরে কেউ বুঝতে পারছে না। তিনি ভুঁইয়া বাড়ীর পুকুরপাড়ের ঘরখানি চেয়ে নিয়েছেন, আর তার পাশেই একখানি সাধনকুটীর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুগত যুবকদল নিজেরাই কুটীর নির্মাণে শ্রম দিচ্ছে। তিনি নিজেও অল্প অল্প কাজ করছেন। শ্রীহস্তে একখানি ধারালো কাটারি। কুমুদ আসছে গোপনে ভগ্নির বাড়ী থেকে। পথে ডাঃ শচীন মজুমদারের বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে দেখা। পরিহাস করে বৃদ্ধা বলেন—"কি গো, তোমাদের সাধু কি গৃহস্থ হলো না কি?"

ঘর বাঁধে গৃহস্থেরা। সাধু কেন ঘর বাঁধবে? তাই বৃদ্ধার শ্লেষ। কিন্তু কুমুদের মনে কোন বিকার নেই, নেই কোনও সংশয়ও। সাধুর ঘর বাঁধার কাজে তাঁর যে রয়েছে বিরাট ভূমিকা। সাধুও হয়তো প্রতীক্ষা করছেন কুমুদেরই। কুমুদ এলে নিজ হাতের কাটারি খানা তুলে দেবেন তাঁরই হাতে। কুমুদ যে তাঁর চিহ্নিত উত্তরসূরী।

বৃদ্ধার বচন কুমুদকে বিচলিত করতে না পারলেও ঐ পরিহাস তিনি ভুলতে পারেন কি? সাধুর কাণে কথাটা তো তুলতেই হবে। নচেৎ স্বস্তি কোথা? শুনে সাধু ক্ষণকাল স্থির। তারপরই স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন হাঁ, **সংসার তো একটা হবেই, তবে পুরুষের সংসার।"**

তাৎপর্য্যপূর্ণ উত্তর। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার। ঐ সাধন-কুটীরখানিই তদীয় মহতী সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। আচার্য্যোত্তর কালে এই পুরুষের সংসারের কর্ত্তা হয়েছিলেন সেই দিনকার কুমুদ আমাদের পরম পূজ্য বড় স্বামীজী। এই লোককল্যাণ দিব্য সংসার রচনায় সেই দিনই তিনি হাত লাগিয়েছিলেন যুগাচার্য্যের প্রথম পার্ষদরূপে। আর জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন ক'রে গেছেন। স্বামী প্রণবানন্দের পুরুষের সংসার তাঁর নেতৃত্বে সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়।

পরমারাধ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী স্মরণে

স্বামী অশোকানন্দ

ইংরাজী ১৯৭৮ সাল, ৮ই জুলাই। রথযাত্রার পুণ্য দিবস। পুরীধামে প্রতিবারের ন্যায় এবারও সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ভোরের মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মেলার সেবাকার্য্যে চলিয়া গিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ স্বর্গদ্বারস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত অগণিত ভক্ত নরনারীকে দর্শন, আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। মধ্যাহ্নের পূজারতি সারিয়া তিনি বিশ্রাম কক্ষে। আহার ও বিশ্রামের পর বৈকালে আবার বারান্দায় উপবিষ্ট।

খবর পাওয়া গেল, এই দিনেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ডায়মণ্ড-হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সেন মহাশয় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

পূজ্য স্বামী যোগানন্দজীর টেলিফোনে জরুরী বার্ত্তা— আমাকে অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইবে। স্বামীজী প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"স্বামীজী যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তখন আজই তুমি বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যাও।" তিনি আমার অন্তরের কথা অনুভব করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"Reservation-এর প্রয়োজন কি?" তিনি ভাবিয়াছেন—আমি রিজার্ভেসন্ ছাড়া যাইতে পারিব না। তিনি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—"জানো Being the President of Bharat Sevasram Sangha I have travelled several times without any reservation?" এই ভাবে তিনি সভাপতি হইয়াও তৃতীয় শ্রেণীতে রিজার্ভেসন ছাড়াই অসংখ্য বার যাতায়াত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে কত ঝুঁকি লইতে হইয়াছে এবং দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি সভয়ে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিলাম "আজই যাইব—রিজার্ভেসন হোউক, চাই নাই হোউক।" এই বলিয়া শ্রীচরণাশীর্বাদ লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

এই প্রসঙ্গে কত কথাই স্মরণ হইতে লাগিল। সভাপতি হইয়াও তিনি অতি সাধারণভাবে সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন—সঙ্ঘের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজকেও অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে মন্দির পরিষ্কার করিয়াছেন, ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, আবার আশ্রমের প্রবেশপথ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন——এগুলি আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজীর মুখেও তাঁহাদের উভয়ের ছাত্রজীবনের কথা, সেবা-কার্য্যের কথা বহুবার শুনিয়াছি। ছাত্রাবস্থায় তাঁহারা উভয়ে জগদ্‌বরেণ্য আচার্য্যবরিষ্ঠ স্বামী প্রণবানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন। সর্বাগ্রে আসিয়াছেন—শ্রীমৎ বড় স্বামীজী—বাল্য নাম কুমুদবন্ধু মৈত্র।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের নির্দেশে ব্রহ্মচারী কুমুদ ও ব্রহ্মচারী মধু উভয়ে খুলনায় আসিয়াছেন। আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা দরকার। তাই উভয়ে আসিয়া দিনের বেলায় খুলনা সহরে, ট্রেনে ষ্টীমারে অর্থ সংগ্রহ এবং রাত্রিতে জাগিয়া হাস-পাতালে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। খুলনা সহরে সঙ্ঘের পরিচিতি ছিল না। রোগীদের সেবা পরিচর্য্যায় এবং তাঁহাদের সাধুতায় বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুগ্ধ। এই কাজের মধ্য দিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইন-জীবী শ্রীজ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

কলিকাতা আশ্রমে একবার শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দজীর খুব জ্বর। পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে দেখিলাম—তিনি অসুস্থ স্বামীজীকে নিপুণভাবে সেবা করিতেছেন।

আমাদিগকে সেবা করার আদেশ করিতেছেন। একেই বলে "শিরদার তো সর্দ্দার।"

পাঠ্য জীবনে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আবার সজ্ঘজীবনে তথা অধ্যাত্ম জীবনেও তিনি প্রথম এবং প্রধান।

তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার কথা প্রচারিত না হইলেও অন্তরঙ্গ সন্তানদের নিকট কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন—ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ভারতের অন্যতম মহাসাধিকা মা আনন্দময়ী তাঁহার আশ্রিত সন্তান ডঃ ত্রিগুণা সেনকে (যিনি তখন ভাইস চ্যান্সলার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) বলিয়াছেন—"ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ ভারতবর্ষে অন্যতম আত্মসমাহিত মহাপুরুষ।" সত্যই তাঁহার অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা, আত্মপ্রত্যয় ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল অপরিসীম। বেদান্তের "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্যের অনুভব বিবৃতি প্রসঙ্গে একদা বলিলেন—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতে পারি—আমিই স্বয়ং জগন্নাথ।" অধ্যাত্মনিষ্ঠায় নিরন্তর নিমগ্ন এই মহাসাধক লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। আবার নিয়মিত ধ্যান, জপ, পূজা, উপাসনা, শাস্ত্রাধ্যয়নে-স্বীয় নিষ্ঠার দ্বারা অপরকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" গীতোক্ত দৈবী সম্পৎ সমূহের পরিচয় তাঁহার চিন্তায়, কার্য্যে, আচরণে, চরিত্রে পরিস্ফুট দেখিয়াছি।

মহাত্মা তুলসী দাস গোস্বামীর দোঁহার কথা মনে পড়ে—

"তুলসী যব জগমে আয়ো
জগ হাসে তুম রোয়ে
ঐসা করনী করকে চলো
তুম হাসে জগ রোয়ে।"
"যবে তুমি এসেছিলে এ নিখিল ভবে
একা তুমি কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে
এমন জীবন হবে করিতে যাপন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।"

পূজ্য বড় স্বামীজীর অন্তিম যাত্রায় সহস্র সহস্র নরনারীর শোকাশ্রুবর্ষণে সেই দৃশ্য দেখিয়াছি। মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন, পুত্র-কন্যা, প্রিয়জন পরিজনের বিয়োগে লোকে শোকে বিহ্বল হয়, চোখের জল ফেলিয়া থাকে, আর্তনাদ করে কিন্তু একজন সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, বিরাগী সন্ন্যাসীর দেহত্যাগে লোকে এত বেদনা অনুভব করে কেন? সন্ন্যাসীর সঙ্গে তো কোন রক্তের সম্বন্ধ থাকে না, তবে কেন এই অশ্রু বিসর্জন!

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিতেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তাই সন্ন্যাসীর কাছে সকলেই আত্মীয়। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও বেশী আপনজন, নিকট আত্মীয়; আত্মার সঙ্গে একান্ত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আর অনুরাগী শিষ্য ভক্তগণকে দিয়াছেন আত্মজ্ঞানের উপদেশ।

স্মৃতিতর্পণে ভক্তিবিনম্র আকুতি

স্বামী পরমাত্মানন্দ

পরম পূজনীয় প্রয়াত শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ যুগাবতার আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের শুধু অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ ছিলেন তা নয়, নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীগুরুসত্তার সঙ্গে নিবিড়তর ভাবে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগুরুচিন্তা ইষ্টচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ক্ষণেকের তরেও অন্তরে স্থান দেননি। তিনি শ্রীগুরু-ভাবের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন এবং শ্রীগুরুপ্রসাদে সকলের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

সঙ্ঘসভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন বিশ্রাম-মন্দিরে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"বাড়ীর মা যখন স্থূলদেহ

ত্যাগ করেন তখন বাড়ীর বধূকে মা সাজাইতে হয়।" সত্যই ভগবৎ পুরুষ আচার্য্যদেবের স্থূলদেহের অবসানের পর পূজ্য বড় স্বামীজী সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর সঙ্ঘের মাতারূপে কনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবকগণ ও সঙ্ঘাশ্রিত ভক্ত নরনারী সন্তান-সন্ততিগণকে স্নেহকরুণা, আশ্বাস, আশীর্ব্বাদ দান করিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছেন। একদিন উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"সভাপতি পদে বৃত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত পাদুকা ব্যবহার করি নাই, খালি পায়ে চলিয়াছি; কিন্তু কোন দিন পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে নাই।" এবং বলিয়াছিলেন—"কাঁটা ফুটিবে কেন? গুরুচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ক্ষণেকের তরেও মনে স্থান পায় নাই।" তাঁর এই ঐকান্তিক গুরুগতপ্রাণতার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়াছি।

একদিন আমার করণীয় দিনচর্য্যা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"কাকচেষ্টা, বকধ্যান, শুননিদ্রা এবং অল্পাহার সাধকদের অবশ্য করণীয় কর্ম ও সাধনা। সাধনজীবনে উন্নতির জন্য কাকের মত অনুক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে, বকের মত ধ্যাননিষ্ঠ হইতে হইবে, কুকুরের মত সদাজাগ্রত নিদ্রা অভ্যাস করিতে হইবে এবং মিতাহারী হইতে হইবে। শ্রীগুরুর দুয়ারে নানারূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ও নিরভিমান-চিত্তে অবস্থান করিতে হইবে, তবেই তাঁর কৃপা, করুণা, শুভাশীর্বাদ লাভ হইবে।"

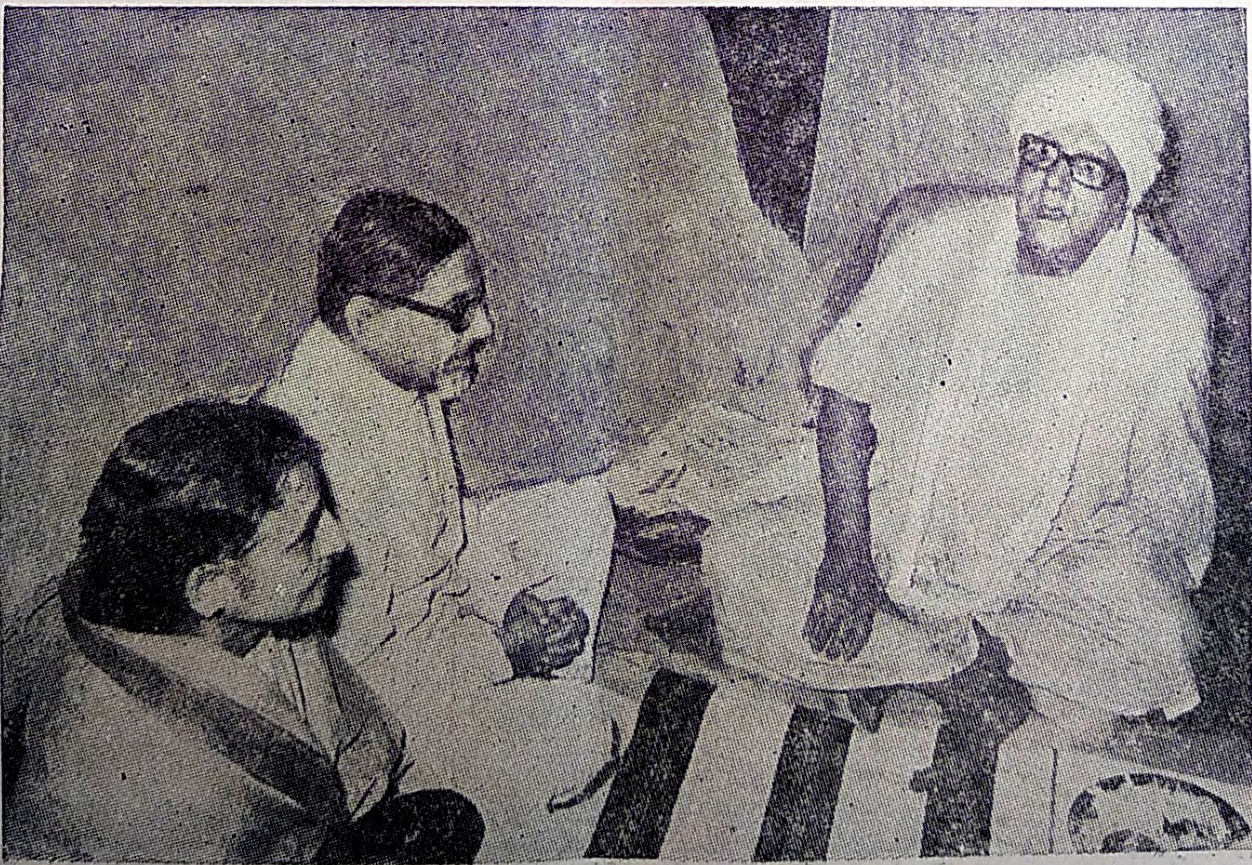
আনুমানিক ১৯৬১ কিংবা ৬২ সনে মাঘী পূর্ণিমার পর বড় স্বামীজী মহারাজ গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন পূজনীয় স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীদের ব্যবস্থাপনায় আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটি গুপ্ত বাড়ীতে বড় স্বামীজী মহারাজকে বিশ্রামের জন্য রাখা হয় এবং সকলের দর্শন প্রণাম নিষিদ্ধ করা হয়। তদানুসারে আমরা তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে কখনই যাই নাই। একদিন পূজনীয় আত্মানন্দজী মহারাজ পূজনীয় বড় স্বামীজী মহারাজের শারীরিক অবস্থা জানিতে সেই গুপ্ত বাড়ীতে গিয়াছেন এবং বিছানাটা নরম কিনা দেখিতেছেন। তখন বড় স্বামীজী মহারাজ আপন মনে বলিতেছেন—"এত বড় অসুখ। ক্ষণেকের তরেও চিন্তা হয় নাই কেন বড় ডাক্তার দেখান হয় নাই। যাঁর সেবার জন্য এই দেহ তাঁর যদি এই দেহের প্রয়োজন না থাকে তবে দেহ চলিয়া যাইবে।" কথাগুলি শুনিয়া ভাবিলাম, বড় স্বামীজী মহারাজ দেহ-মন-প্রাণ সবই শ্রীগুরুচরণে নিঃশেষে মিলাইয়া দিয়াছেন।

১৯৪১ সনে সঘে যোগদানের পর আমি প্রায় ৭ বৎসর কলিকাতা আশ্রমে ছিলাম। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের ভোগের পর দোতলা হল ঘরে সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিত। ২ ঘণ্টা ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া আমাকে এক হাতে বড় স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশে পরিবেশন করিতে হইত। পান্তা ভাত প্রায় দিনই থাকিত। প্রথমে বড় স্বামীজী মহারাজ ৩ মুষ্টি পান্তা ভাত গ্রহণ করিতেন। সকলকে কিছু কিছু দেওয়ার নির্দ্দেশ। একদিন সকালে আমি কিছু খাই নাই। ২টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় খুব কষ্ট পাইয়া মনে মনে ভবিতেছি আমাকে কেন খাওয়ার নির্দ্দেশ দিতেছেন না। তখন বড় স্বামীজী মহারাজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এক মায়ের যদি শত সন্তান থাকে, আর যদি শতজন খাইতে আসে। মা কি তাতে বিরক্ত হয়?" এই বলিয়া আমাকে খাইতে বসার নির্দ্দেশ দিলেন। আমি ইহাতে লজ্জিত হইয়া খাইতে বসিলাম। সত্যই তিনি মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।

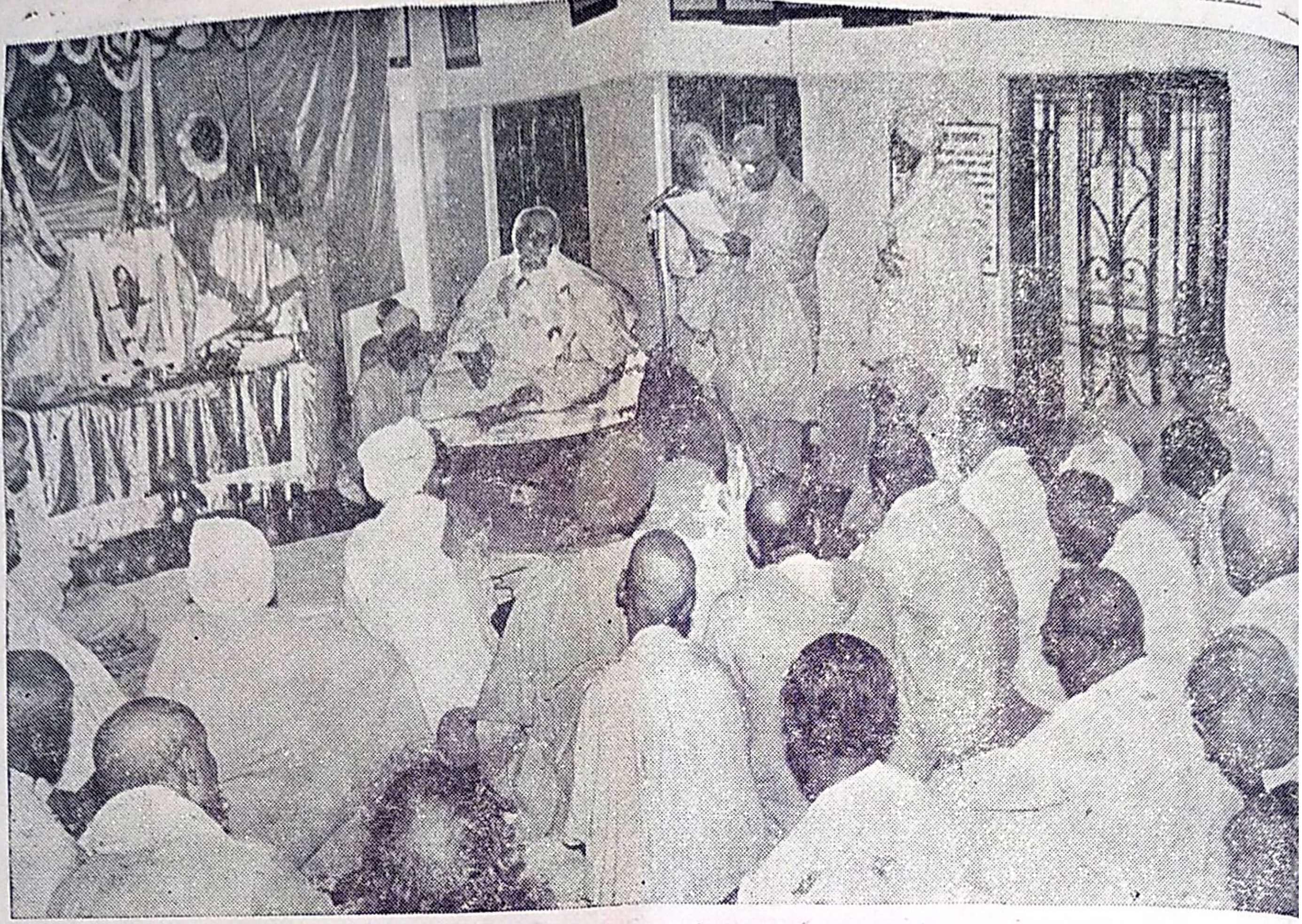
এত বড় আধ্যাত্মিক তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের স্থূল-দেহের অবসানে সঙ্ঘের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমাদের যে কি অন্তর্বেদনা তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর স্মৃতিতর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্নেহসুশীতল শ্রীচরণে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি—হে গুরো! আমরা অবোধ অকৃতি সন্তান তোমার। তোমার অধ্যাত্ম অপার অপরিমেয় শক্তির ধারণা আমাদের সাধ্যাতীত। তুমি আমাদের অজ্ঞানতা তমসাচ্ছন্নতা দূর করিয়া তোমার প্রজ্ঞার আলোকে আমাদের উদ্ভাসিত কর। আমাদের কল্যাণ কর। আমাদের আশীর্বাদ দান কর। তোমার রাতুল চরণে আকুতি প্রার্থনা।



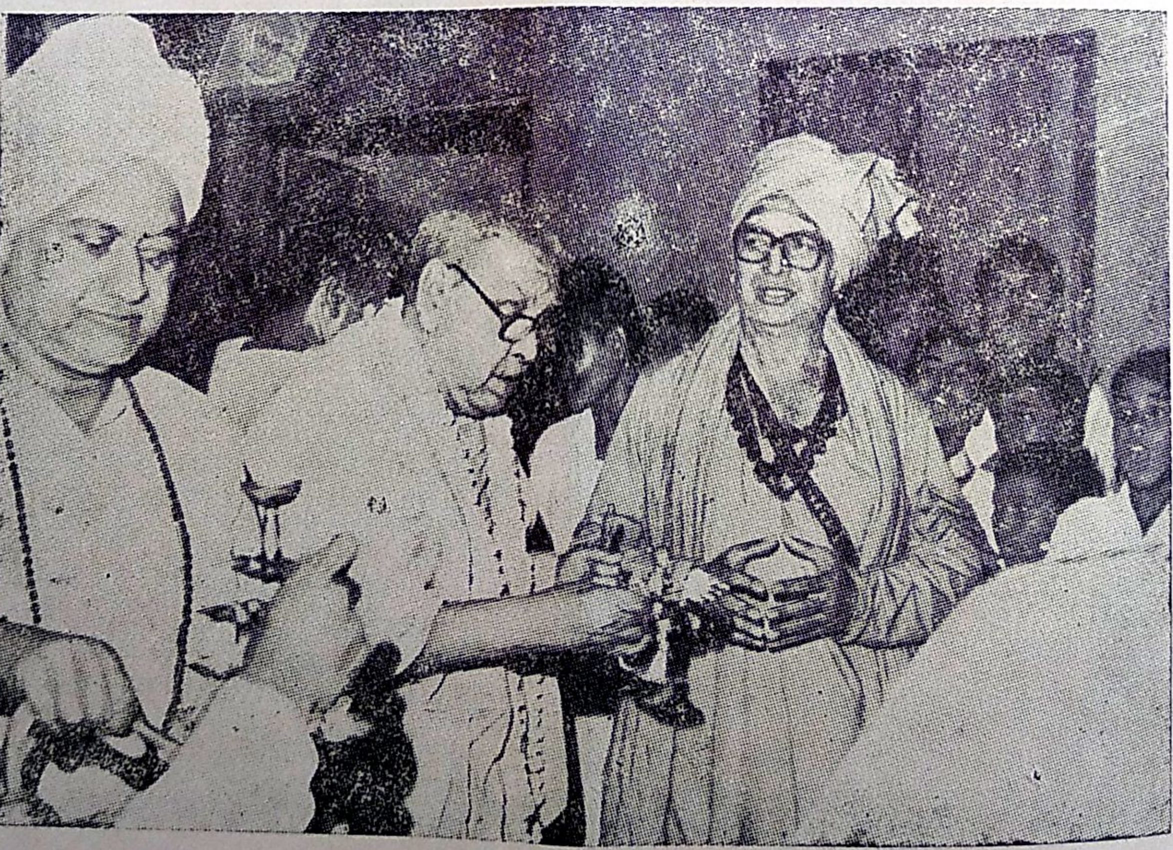
কলিকাতা প্রধান কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রী জৈল সিংহের সহিত শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।



পুজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামী মহারাজের সহিত সস্ত্রীক পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী বি, ডি, পাণ্ডে কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয়ে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন।



সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন পুজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী।



শ্রীগুরুমন্দিরের সিদ্ধাসনে আরতি করছেন পুজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ।

অভিন্ন সত্তা

ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর, অগণিত ভক্তের হৃদয়ানুরাগে রঞ্জিত, নির্মাণ-মোহ, আবাল্য বৈরাগ্যপ্রবণ, সদাশয়, পরিমার্জিতধী বড় স্বামীজী অর্থাৎ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ আর মরদেহে নেই। তাঁর ভক্ত, অনুরাগী, কৃপাভিলাষী, আপ্লুত,-হৃদয় ব্যক্তিবর্গ আজ শোকাচ্ছন্ন। ব্যক্তিগত ভাবে ধীরে ধীরে এই মহাপুরুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা লক্ষ্য করতে পারিনি, কারণ, কাছের মানুষের সঙ্গে কাছে থাকাকালে সম্পর্কের গভীরতা তেমন অনুভব করা যায় না। এই অনুভূতি বিচ্ছেদের কালেই মনে প্রাণে এমন নাড়া দেয় যার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কষ্টকর। এতজন শোকগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাশে দেখতে পেয়ে আমারও শোকের ভার লাঘব হয়েছে এবং ঠিক কিভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভাষায় প্রকাশ করব তা বুঝে উঠতে কষ্ট হচ্ছে।

একটানা ৪৮ বৎসর বড় স্বামীজী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অভাব স্বাভাবিক ভাবেই সকলের মনে নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর সিদ্ধাসনে প্রণাম নিবেদন করার জন্য স্মৃতি-তর্পণের বিশেষ দিনটিতে যে সুদীর্ঘ সারি দেখেছিলাম তাতে বুঝতে পারি যে, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

বড় স্বামীজী কেবল যে গুরু মহারাজের পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন এমনটি নয়, কিন্তু তিনি সেই ভাবের ও আদর্শের উত্তরাধিকার সারা জীবনেই কাজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন। আচার্যের সন্ধ্যারতি শেষ হল, চরণামৃত গ্রহণ করলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—এই ঘটনাগুলি কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিহীন কাকতালীয় নয়, একথা ভক্তের হৃদয়ে যেমন উদ্‌ভাসিত হয় তেমনই যুক্তিবাদীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বড় স্বামীজী আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের ৮ই জানুয়ারী তারিখটিকেই নিজের ইহলোক ত্যাগের জন্য বেছে নিয়ে আচার্যের আদর্শের অনুগামিতাকে একটি প্রত্যক্ষরূপ দিলেন। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, স্বামী প্রণবানন্দজী ১৯৪১ সালের ৮ই জানুয়ারী মরদেহ ত্যাগ করেন এবং স্বামী সচ্চিদানন্দজী ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৯, পরলোকগমন করেন।

আনন্দই মানুষের জীবনে সকল কাজের মূল প্রেরণা। আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে আমরা সকল কাজ করে থাকি। এর জন্য মানুষ, শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণী সব সময়ই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় চেষ্টা করে চলেছে। পূর্বাশ্রমের নিকুঞ্জ, যিনি পরে স্বামী আত্মানন্দ নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে জানতে পারি যে, গুরু মহারাজের ভালবাসার অনাবিল হাসিটুকু তাঁদেরকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গুরু মহারাজের শান্ত স্নিগ্ধ হাসি পূর্বাশ্রমের কুমুদের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজীর মধ্যেও এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যার সাক্ষাৎ লাভের জন্য বহু মানুষ দূর দূরান্ত থেকে নানা কাজের ফাঁকে ছুটে আসত। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে দীর্ঘ দিন যাতায়াতের ফলে কতগুলি দৃশ্য যেভাবে দেখেছি যার ছবি প্রায়ই ফুটে ওঠে। কলকাতা শহরে এসেছেন সুদূর মফঃস্বল থেকে বড়বাজারে কতকগুলি কেনাকাটার জন্য। দুই ব্যাগ ভর্ত্তি জিনিসপত্র নিয়ে গরমে ঘেমে এসে বড় স্বামীজীকে প্রণাম করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও আছি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকায় পরিচয় হল। বড়বাজার থেকে বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া সন্ধ্যার কলকাতায় কেমন দুর্গম তা সকলেই জানেন। যিনি হাওড়া স্টেশনে আগের লোকাল অথবা এক্সপ্রেস ধরার জন্য ছোটাছুটি করেন, তিনি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করলেন, দু'বার, বড় স্বামীজীর পাদস্পর্শে নিজেকে পবিত্র করার জন্য। বড় স্বামীজীর স্নেহচ্ছায় ও আশীর্বাদে 'শোকাহত পুরুষ ও নারী—কিভাবে, প্রাণ ফিরে পেয়েছেন ও শান্ত ধার্মিক জীবন যাপন করছেন তা প্রসঙ্গ ক্রমে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমিও জানতে পেরে

বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নেই। বুঝেছি যে, বড় স্বামীজী ছিলেন গুরু মহারাজের ভালবাসারই নিরালা নিলয়, উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু স্নিগ্ধ ভালবাসা আছে।

একদিন সন্ধ্যায় বড় স্বামীজীকে দর্শন করে কিছু কথা বলার সৌভাগ্য হল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাজের ধারা, প্রগতি, সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার ফাঁকে তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন যা চিরকাল মনে থাকবে। তাঁর বক্তব্য ছিল -"আমি আর কি বুঝি। গুরু মহারাজ যতদিন সামনে ছিলেন তাঁর কথায় চলেছি। পরে বেদ, বিজ্ঞান ও অদ্বৈত স্বামী যা বলেছে তাই করেছি। কথাটুকু শোনামাত্র নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের আদর্শ নিমেষে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবছিলাম যে, স্বামী বেদানন্দজী তো সাধারণ সম্পাদকই ছিলেন, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তো ছিলেন সহ-সভাপতি, আর শেষ জীবনে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীও ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। এই তিন জনের উপরে সভাপতি-পদে দীর্ঘকাল ধরে তো ইনিই ছিলেন. এবং রয়েছেন, তবে এই উক্তির সার্থকতা কোথায়? মনে পড়ল, আদর্শের জগতে অধিনায়ক কখনই dictator নন, বড় স্বামীজী কোনদিন dictator হন নি, তিনি যতটা আদেশ দিয়েছেন ততটাই আদেশ মেনেছেন। ভালবাসা হুকুম দিতেও পারে, হুকুম তামিলও করতে পারে। ভালবাসাই সঙ্ঘের প্রাণ।

আমি শিক্ষক জেনে একদিন সন্ধ্যায় বলছিলেন, "আপনি শিক্ষক, ছাত্রদের চরিত্র গঠন আপনার পবিত্র কর্ত্তব্য। ছাত্র তৈরী করুন, ভাল ছাত্র চাই। আজকাল ছাত্রেরা বড় ভোগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই তারা ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার দেখুন কত ছাত্র দু'বেলা খেতেও পায় না। আমাদের ছাত্রাবাসে অনেকে থাকে তাদের কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্যপালন ও আদর্শকে সামনে রেখে কৃচ্ছ্রসাধন বিশেষ প্রয়োজন।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, ছাত্রজীবনে প্রাচীন আদর্শের কথা বলার লোক আর কজন আছে? এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয় গুরুমহারাজের বক্তৃতার একটি অংশ যেখানে তিনি বৃটিশের কূটনীতি ও বুদ্ধিমত্তার কথা স্মরণ করিয়ে অতিমাত্রায় ভোগেরও স্বাচ্ছন্দ্যের নিন্দা করেছেন। বৃটিশেরা যখন দেখল যে, অত্যাচার ক'রে বন্দী ছাত্রদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যাচ্ছে না এখন তারা প্রাচুর্য ও ভোগের মধ্যে তাদের ডুবিয়ে দিল। এর ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে; সেই ছাত্রদের বিপ্লবের দৃঢ়তার সংকল্প ক্রমশঃ ম্লান হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোক মনে পড়ে—

"ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ (২।৪৪)

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ এই দুই গুরু-শিষ্যের বয়সের পার্থক্য এত কম যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ১৯১১ সালে যখন উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন আচার্যের বয়স ১৫ এবং শিষ্যের বয়স ১২। পূর্ব-নির্ধারিত না থাকলে এমনটি বড় একটা হয় না। গুরু মহারাজ ছিলেন জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ, ওজোবীর্য্যময়, তেজোস্বিতায় ভরপুর। স্বামী সচ্চিদানন্দজী ছিলেন উপরে প্রশান্ত অথচ ভিতরে তপস্যার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। মনে হয় যেন এই দু'য়ে মিলে এক অভিন্ন সত্তা। আচার্য উপরে উগ্র, ভিতরে শান্ত স্নিগ্ধ। শিষ্য উপরে প্রশান্ত, ভিতরে তপস্যার ও ত্যাগের প্রজ্জ্বলিত আহুতি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই বিপুল কর্মপ্রেষণা. কর্মযোগ ও কর্মযজ্ঞে এই উভয়ের মিলিত অবদান অনস্বীকার্য সত্য।*

---

* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গড়িয়া কেন্দ্রে ২২।১।৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্বামী সচ্চিদানন্দজীর স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে।

অমর স্মৃতি

ডঃ সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

যতদূর মনে পড়ে ইং ১৯৪৮ সালে এক শীতের দ্বিপ্রহরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে যাই। কিন্তু পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি মহারাজের সঙ্গে ঐ অসময়ে সাক্ষাৎ মিলে না। তবে দর্শন পাই পূজ্য বেদানন্দজীর। নামটি মিষ্টি, কিন্তু অত্যন্ত রাসভারী মানুষ। জ্ঞান ও মনীষার খনি।

তারপর ১৯৫২ সালের শেষের দিকে আবার যাই। সঙ্গে এক পশ্চিমী সহপাঠী। এবার অভীষ্ট দর্শন পাই পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর। তিনি অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে হিন্দুদের জাতীয় সমস্যার কথাও বলেন। ভারতে তিনটি জাতি প্রধান—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও হিন্দু শতধা বিচ্ছিন্ন। ভারতের কল্যাণ হিন্দুর ঐক্যের ভিতরে। হিন্দু যত ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে দেশ তত এগুবে।

১৯৫২-৫৪ দু'বছর রোজ যেতাম আশ্রমে। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের মন্দিরে ভজন শুনতাম সাধুদের কণ্ঠে। নিবিষ্ট হয়ে যেতাম ঐ অন্তরে সাড়া জাগানো ভজনের ভাবরসে। কারো সঙ্গে কথা হতো না। পূজ্য বড় স্বামীজীর সঙ্গেও নয়। অল্প কিছুকালের জন্য অনিয়মিত হলেও ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত আশ্রমে যাতায়াত ছিল প্রাত্যহিক। কি জানি কেন পূজ্য স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোন তাগিদ অনুভব করিনি তখন। সঙ্ঘানুষ্ঠিত উৎসবাদি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পূজ্য শ্রীমৎ বেদানন্দজী ও পূজ্য শ্রীমৎ অদ্বৈতা-নন্দজী প্রভৃতির ভাষণ শুনতাম, আর শুনতাম সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে ভজনের পর ভজন। এতে জীবনের গতিপ্রকৃতিই যায় বদলিয়ে। সেই যৌবনে কলকাতা সহরে থেকেও সিনেমা, থিয়েটারের ব্যসনে না গিয়ে মন্দিরে বসে সন্ন্যাসীদের প্রাণ-ঢালা কীর্তনে ডুবে থাকতে ভালবাসতাম। আর নিয়মিত অংশ গ্রহণ করা হতো সান্ধ্য উপাসনায়।

১৯৬৫-৭২ পর্য্যন্ত কলকাতার বাইরে। ফলে আশ্রম-সান্নিধ্যে ছেদ পড়ে। কিন্তু সৌভাগ্য! ৭৩ সালে বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় একেবারে আশ্রমের কাছাকাছি—একই রাস্তার উপর, একই পাড়ায়। সুতরাং, সান্ধ্যোপাসনায় যোগদান আবার চলতে থাকে—পূর্ববৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে। পূজ্য বড় স্বামীজীর সদয় দৃষ্টি পড়ে নগণ্য সেবকের উপরে। একদিন মহাপুরুষ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীকে "ঐ লোকটা কে? রোজই এখানে আসে? কি নিষ্ঠা! কি নিয়মানুবর্ত্তিতা! ওকে ন্যাশনাল এওয়ার্ড দেওয়া উচিত।" জগদীশ্বরানন্দজী হাসতে হাসতে আমাকে এ কথা বলেন। এ কি মহাপুরুষের নিজের কথা? যদি তা হয়, তবে পূজ্য বড় স্বামীজী নিশ্চয়ই হাস্যচ্ছলেই বলেছিলেন। কিন্তু এতো পরিহাসের হাসি নয়—এ হাসি প্রসন্নতার। তিনি অধমের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি আছে জগতে?

একদিন প্রণব পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ (বর্ত্তমানে সম্পাদক) স্বামী নির্ম্মলানন্দজী আদেশ করেন একটা কিছু লিখতে। কিন্তু লেখা-টেকা আমার বড় আসে না। অনেক চেষ্টা করে একটা লেখা খাড়া করা গেল। দিলাম স্বামীজীকে। তাঁর হাতে মার্জ্জিত হতে হতে তার আসল রূপটাই গেলা পালটিয়ে। প্রণবে প্রকাশিত হলো। ওমা, কে জানতে সেটি পূজ্য বড় স্বামীজীর নজরে পড়বে! সন্ধ্যারতির পর তাঁর ব্যক্তিগত সেবক জানালেন—"বড় স্বামীজী আপনাকে ডাকছেন।" ভয়ে ভয়ে গেলাম মহাপুষের শ্রীচরণপ্রান্তে। অজস্র আশীর্বাদ! আর স্নেহবাৎসল্যে জড়িয়ে ধরলেন। লেখাটির প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হলো শ্রীকণ্ঠে। আমার কাঁচা হাতের লেখা। আমি কি এত আশীর্বাদের যোগ্য? শিশুর আধো আধো বোল জনক-জননীর কাছে মিষ্টি লাগে কেবল তাঁদের অযাচিত স্নেহের প্রসাদেই। এও যেন তা-ই।

সস্ত্রীক দীক্ষামন্ত্র যেদিন লাভ হলো সেদিন জীবনের

এক মহাপুণ্যক্ষণ। এমন উন্নত মার্গের সদ্গুরুর আশ্রয় বহু সৌভাগ্যেই ঘটে। দীর্ঘদিন নিয়মিত আশ্রমে যাতায়াতের ফলে অতি নিকট থেকেই তাঁকে দেখেছি। দেখেছি সঙ্ঘের মহামান্য সভাপতি ভরা দুপুরের প্রচণ্ড তাপে ছাতা মাথায় দিয়ে অতি সাধারণ বেশে শ্রীনাথ হল নির্ম্মাণে কর্ত্তব্যরত মিস্ত্রী ও মজুদের কার্য্য তত্ত্বাবধানে নিরত। আরো শুনেছি বালিগঞ্জের ১৯৩১-৩২ সালে প্রধান কার্য্যালয় যখন প্রথম তৈরী হয় তখন অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তিনিও মাথায় করে ইট বয়েছেন, মজুরের সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন দুরমুজের কাজে—শ্রীগুরুর আদেশে। তখন কিন্তু তিনি সঙ্ঘের সহ-সভাপতি। কি নিরভিমান! শ্রীগুরুর আদেশ পালনে কি নিষ্ঠা! নিজে শ্রমদান ক'রে দিয়েছেন শ্রমের মর্য্যাদা।

আর মহাপুরুষের কি ত্যাগ! কলকাতার ভ্যাপসা গরমেও মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ঝুলাতে দেননি। একবার সেবকেরা তাঁর অনুপস্থিতিতে একটি পাখা খাটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এসেই কিন্তু তা খুলিয়ে দেন। মেঝের উপর মাত্র কম্বল বিছিয়ে শুয়েছেন বহুকাল। কারণ তাঁর পরমারাধ্য শ্রীগুরুর কলকাতার আশ্রমে কখনো কোন খাট বা তক্তাপোস ব্যবহার করেন নি—তোষক আর কম্বলের বিছানায় আজীবন অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং, তিনি কি ক'রে উচ্চাসন ব্যবহার করবেন? অথচ স্বামীজীর প্রয়োজন। কারণ, তার ঠাণ্ডার ধাত। সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর শয্যাসনটি কয়েক ইঞ্চি উচ্চ কাষ্ঠাধারের উপর বিন্যস্ত ক'রে দেন। স্বামীজীর শয্যাসনও মেজের শৈত্য কাটিয়ে কিঞ্চিৎ উপরে স্থাপিত হয়। তবে সেটি খাটও নয়, তক্তাপোষও নয়—একটি বড় মাপের কাঠের পিঁড়ে মাত্র এবং তার উচ্চতা শ্রীগুরুর আসন থেকে তুলনায় ন্যূন। গুরুভক্ত মহাসাধক কি গুরুকে অতিক্রম করতে পারেন? ঐ শয্যাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কত টুকরো স্মৃতি অন্তরে ভাসছে। একদা আরতির মন্দিরে ধ্যানমগ্ন আছি। মনে হলো, তিনি কি অন্তর্য্যামী পুরুষ? তা হলে করুণা ক'রে আমায় এ অবস্থায় এসে দেখা দিন না। ঐ সময় তিনি মন্দিরে কখনো আসেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেদিন তার বিশ্রাম গৃহের দ্বার খুলে গেল। মন্দিরে এসে শ্রীগুরুর পাদুকায় প্রণাম ক'রে নীরবে ফিরে গেলেন। আর একদিন তন্ময় হয়ে শ্যামাসঙ্গীত শুনছি। পূজ্য স্বামীজী মৃদুমন্দ চরণে ভাবাবেশে যেন ঢুলতে ঢুলতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ঐ দৃশ্য, ঐ ভাব বড় ভাল লাগলো। এক মাঘী পূর্ণিমায় আমার দুই ছেলে ধ্রুব ও প্রতাপের উপনয়ন হলো আশ্রমে। পূজ্য স্বামীজীর আশীর্ব্বচন—"তোমাদের মঙ্গল হোক! দেশের কল্যাণ হোক!" ব্যষ্টিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার প্রেরণাও জাগিয়ে দিলেন দুই মানবকের তরুণ অন্তঃকরণে। তারা যেন কেবল নিজের ভালটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত না থাকে। দেশের সন্তানকে দেশের ভালও দেখতে হবে।

একদিনের স্মৃতি ভুলবার নয়। সেদিন সান্ধ্য উপাসনার পর পূজ্য বড় স্বামীজীর ঘরে গিয়ে সকলেই প্রণাম করছে। আমিও করেছি। অতি মৃদু আলো জ্বলছে। সেই আলোকেই তিনি সন্তানকে চিনেছেন। প্রণাম করতেই ব'লে উঠলেন—"আমাগো সরোজ? ওকে প্রসাদ দাও।" একদিন যাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল লোকটা কে? রোজই আসে? আজ সেই লোকটাই তাঁর কাছে "আমাগো সরোজ।" এত আপনার ক'রে নিয়েছেন? কি মিষ্টি সেই সম্বোধন!

অহো, ধন্যোঽহম্!

"সঙ্ঘ চায়—শক্তি ও শান্তি। যেখানে সংযম সেখানেই শক্তি। আর যেখানে শক্তি সেখানেই শান্তি। সুতরাং, সংযম লইয়া সব সময় চলিলে আর কোন প্রকার দুর্ব্বলতা কদাচ কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

একদিনের কথা

ডাঃ শ্রীসুখময় সরকার

১৯৮২ সাল। মে মাসের মাঝামাঝি। উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষক হিসেবে কলকাতায় গিয়েছি পরীক্ষার খাতা আনতে। আমার প্রধান পরীক্ষক থাকেন পূর্বপুটিয়ারিতে। সুতরাং, স্থির করলাম কুলটি থেকে কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে সোজা বালিগঞ্জ আশ্রমে গিয়ে উঠবো বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ; তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনে প্রণতি নিবেদন করে এবং পূজ্য স্বামীজীদের চরণ বন্দনা করে বেলা দুটোর পর পূর্ব পুটিয়ারি রওনা হয়ে যাবো। বিকেল তিনটেয় প্রধান পরীক্ষকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা। আমি কিন্তু আশ্রমে কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীকে পূর্বাহ্নে পত্র দিয়ে আমার আশ্রম-যাত্রার কথা জানাই নি।

পৌনে বারোটার সময় বালিগঞ্জ আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি; দেখা হয়ে গেলো স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর সঙ্গে। স্বামীজীকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "ও! এই তো আপনি এসে পড়েছেন। বড়ো স্বামীজী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। উনি বললেন, সুখময় আজ আসবে; এলেই আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিস্ তো! যান যান, উনি নিজের ঘরেই আছেন।"

আমি তো বিস্ময়ে হতবাক্। এ কি চমক সৃষ্টির কথা! আশ্রমে কোন স্বামীজীকেই আমি জানাই নি যে আমি আজই আসছি। স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী তাড়া দিয়ে বললেন, "যান, যান, তাড়াতাড়ি যান। বড় স্বামীজী একটু পরেই আহার করবেন, তারপরেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোবেন। আবার সেই রাত্রে আরতির পর দর্শন হবে। তখন তো আবার দর্শনার্থীদের ভিড় হয়ে যাবে। এখুনি বরং গিয়ে দর্শন করে নিন।"

মহাপুরুষের কথা চিন্তা করতে করতে আমি যন্ত্রবৎ প্রথমে শ্রীমন্দিরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনে প্রণাম করলাম এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পরমপূজ্য বড় স্বামীজীর কক্ষে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি একা বসে আছেন তাঁর আসনে। অন্যান্য সময়ে যখনই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছি, তখনই দেখেছি— অন্ততঃ দু-তিন জন সেবক রয়েছেন তাঁর কক্ষে; ভক্তেরা কেউ-না-কেউ আসছে দর্শন এবং প্রণাম করতে। আজ কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ একা। মহাপুরুষের শ্রীচরণে মাথা রাখলাম। তিনি আমার মাথাটি বেশ করে চেপে ধরে বললেন, "বেশ লিখছ বেশ লিখছ! লিখে যাও। একটা বই ছাপাও। ঠাকুর তোমায় আশীর্বাদ করবেন।"

১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে পূজোর সময় আমি বাজিতপুর ধামে সিদ্ধপীঠদর্শনে যাত্রা করেছিলাম। বাংলা দেশে আমার অভিজ্ঞতার কথা 'সিদ্ধপীঠযাত্রীর ডায়েরি' নাম দিয়ে লিখে পাঠিয়েছিলাম স্বামী নির্মলানন্দজীর কাছে। তিনি ঐ লেখাটি ১৯৮২ সালের জানুয়ারি থেকে 'প্রণবে' প্রকাশ করছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। বুঝতে পারলাম, পরম পূজনীয় বড় স্বামীজী আমার এ লেখাটি পড়ে খুব খুশী হয়েছেন এবং সে জন্য আমায় আশীর্বাদ করে উৎসাহিত করছেন। মহাপুরুষের সস্নেহ স্পর্শে আমার দেহ-মন-প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্নটা বারংবার খোঁচা দিতে লাগলো—আমি যে আজই আসবো, একথা তিনি জানলেন কেমন করে? মুখে কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সাহস হলো না।

শ্রীচরণ থেকে মাথা তুলে আবদার করে বললাম, "বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুরের এমন কোন প্রসঙ্গ আজ আমায় বলুন যা কেউ বড়ো একটা জানে না; আমি আপনার এই কথাগুলি লিখে রাখবো।"

একজন সেবক দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করছিলেন। পূজ্য বড় স্বামীজী ইঙ্গিতে তাঁকে বাইরে যেতে বললেন। কক্ষের মধ্যে এখন তিনি আর আমি।

১৯২১ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা বলতে

লাগলেন পূজ্য বড়ো স্বামীজী। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স মাত্র পাঁচিশ বৎসর ; তখনও তিনি স্বামী প্রণবানন্দ হ'ন নি ; তখনও তিনি ব্রহ্মচারী বিনোদ। সে সময় তিনি খুলনা সহরের নিকট ভৈরব নদের অপর পারে বেলফুলিয়া আশ্রমে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য খুলেছিলেন আর্ত্তত্রাণ-কেন্দ্র। মহামণ্ডলেশ্বর ভোলানন্দ গিরি মহারাজ একদিন এসেছিলেন বেলফুলিয়া আশ্রম পরিদর্শন করতে। প্রবীণ সাধক গিরি মহারাজের একটি মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তরুণ ব্রহ্মচারী বিনোদ। সেদিন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমি বাবা গম্ভীরনাথ।" এই ঘটনার সাক্ষী স্বয়ং বড় স্বামীজী (তখন ব্রহ্মচারী কুমুদ)। এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন বড় স্বামীজী এবং অবশেষে বললেন, এই ঘটনা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, আমি সেদিন ব্রহ্মচারী বিনোদের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলাম। ইচ্ছে করলে তুমি এই ঘটনাটি লিখতে পারো ; কিন্তু এমন ভাবে লিখবে যাতে কেউ ক্ষুব্ধ বা আহত না হয়। অপ্রিয় সত্যও তো বলা উচিত নয়।১

সেবকেরা এসে পড়লেন। বললেন, "বাবার আহারের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।" আমি শ্রীপাদপদ্মে মাথা ঠেকিয়ে আর একবার প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, পূজ্য বড় স্বামীজী বারংবার বলতে লাগলেন, না খেয়ে যেও না ; না খেয়ে যেও না।" কিন্তু তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দোতলার হল ঘরে দেখি চিরাচরিত প্রথানুযায়ী খিচুড়ি প্রসাদ ভোজন করছেন শতাধিক নরনারী। প্রচণ্ড গরম পড়েছে ; তার ওপর শরীরটা বেশ ভালো যাচ্ছে না। খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা হলো না। নীচের তলায় এসে স্বামী নির্মলানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, "পূজ্য বড় স্বামীজী প্রণবে আমার লেখা পড়ে খুব খুশী হয়েছেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আর বললেন, একটা বই ছাপাও।

বললেন তুমি অতি ভাগ্যবান্, সুখময়। বড় স্বামীজীর আশীর্বাদ মানে স্বয়ং গুরুমহারাজের আশীর্বাদ। আর তিনি যখন বই ছাপানোর কথা বলেছেন, তখন জেনে রেখো—বই ছাপানো হবেই।২

স্বামীজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে আশ্রম ভবন থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম, একটা হোটেলে ভাত খেয়ে নেবো, নইলে আজ আর খাওয়া হবে না। বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি গিয়েছি, এমন সময় দেখি, একজন ব্রহ্মচারী আসছেন ছুটতে ছুটতে। কাছে এসে বললেন।

"বড় স্বামীজী আপনাকে খেয়ে যেতে বললেন, আপনি না খেয়ে চলে যাচ্ছেন কেন ?"

"আজ্ঞে, আমি খিচুড়ি খাই না।

"খিচুড়ি খাবেন কেন ? আপনার জন্য ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন, আসুন। বড় স্বামীজী আমায় পাঠালেন।" আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলাম। অনুভব করলাম, এই উগ্রতপা মহাপুরুষ কেবল অন্তর্যামী এবং ঋতবাক্ই নন, ইনি নিবিড় মাতৃস্নেহের আধার, যা দিয়ে এই অর্ধশতাব্দী কাল ধরে রেখেছেন মহাসঙ্ঘ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে।

---

১ লেখকের রচিত "আচার্য্যবরিষ্ঠ প্রণবানন্দ" গ্রন্থে এই ঘটনাদি সন্নিবেশিত হয়েছে "আমি বাবা গম্ভীর নাথ" এই শিরোনামে। —সম্পাদক

২ অল্পকাল মধ্যেই "সিদ্ধপীঠের পথে" বইখানা ছাপা হয় এবং তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। —সম্পাদক

"মনকে সতত গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে অত্যল্প কালের ভিতরে ধর্মজীবনের অনেক রহস্যের উদ্ভেদ হইবে।"

—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর স্মরণে

স্বামী প্রেমানন্দ

গুরু মহারাজের দেহত্যাগের পর পূজ্য বড় স্বামীজীর কাছে খুব কেঁদে ছিলাম, তিনি অতি প্রসন্ন চিত্তে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, "আমি আছি তোমার ভয় নেই, সদাসর্ব্বদা গুরুমুখী হয়ে চলবে, শ্রীগুরু স্মরণ করবে।" এই মধুমাখা বাক্য শুনে, সেই ভরসা নিয়ে চলছিলাম।

স্মৃতিপটে আজ কত কথাই না ভেসে উঠছে! যখনই বড় স্বামীজীকে প্রণাম ক'রতে গেছি তিনি মাথায় হাত দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে তার তপঃশক্তি সঞ্চার করেছেন। আমি বা অন্য সঙ্ঘ-সন্তানের কথা নয়, সকল দর্শনার্থীদের-এ ভাবে তিনি আশীর্বাদ ও উপদেশ দান করেছেন।

হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কৃতি-সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত বাণী সকলকে শোনানো হতো। সেই বাণী শ্রবণে জাতির যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, জাতি যেন মোহঘুম ছেড়ে জেগে উঠছে।

কতকগুলি ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে মনে ভেসে উঠেছে। বেনারসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সেরে মেলট্রেনে গুরুজীর সঙ্গে হাওড়া যাচ্ছি। কিন্তু কিছু অর্থসংগ্রহের জন্য গুরুমহারাজ আমাকে হাজারীবাগ রোডে নামিয়ে দিলেন। বড় স্বামীজী ট্রেনের অন্য কামরায়। গুরুমহারাজের ডাক শুনে সম্মুখে এসে বড় স্বামীজী নতজানু হয়ে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বড় স্বামীজীর বিনম্র আচরণ ও ভঙ্গি দেখে অভিভূত হলাম। কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা শ্রীগুরুর প্রতি!

অন্য একটা ঘটনা। কলকাতা বালীগঞ্জ আশ্রমে গুরু মহারাজ তাঁর বিশ্রাম কক্ষে উপবিষ্ট। আমি প্রচার কার্য্যে বাইরে চলেছি। আমার সাথে বড় কয়েকটা পুঁটলী। একার পক্ষে মালগুলি সামলানো বেশ অসুবিধা। পরন্তু ট্রামে-বাসে ওঠা বেশ শক্ত ব্যাপার। অন্য লোক সেখানে সেই যে ফরমান করবো সাহায্য করতে। আমার অসুবিধা লক্ষ্য করে গুরুমহারাজ বড় স্বামীজীকে বল্লেন —"দেখছো না প্রেমানন্দ মুস্কিলে পড়েছে, তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে এসো।" তৎক্ষণাৎ বড় স্বামীজী আমার কাছে এসে বল্লেন—"চল লক্ষ্মীটি, আমি তোমায় গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।" এই কথা বলেই স্বামীজী সবচেয়ে বড় বোঝাটি নিজের মাথায় তুলে নিলেন এবং গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। তখন তিনি সঙ্ঘের সহ-সভাপতি। কী নিরভিমান! গুরুর আদেশ পালনে কী অকপট নিষ্ঠা!

সেবারের কথা এখনও মনে আছে। 'কাণ্ডারী' নৌকাযোগে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সমেত সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীরা চলেছি জলপথে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করায় সকলের প্রচণ্ড ক্ষুধার জালা। এধারে গতদিনের তিন-চার ঝুড়ি ভাত নৌকায় তখনও মজুত। কিন্তু সে ভাত পর্য্যুষিত। মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। অনেকে ভাতের অবস্থা দেখে, খেতে অনিচ্ছুক। গুরুমহারাজ হুংকার দিয়ে জানিয়ে দিলেন সাধুদের বিবেক-বৈরাগ্য ও সাধনার কথা। বল্লেন—

"আমি হাতে করে বিষ দিলেও সে বিষ অমৃত হয়ে যাবে।" নদীর জলে ভাতগুলি পরিষ্কার করে ধুয়ে গুরু-মহারাজের ভোগ দেওয়া হলো। তারপর আমরা তা অতি আদরের সঙ্গে অমৃতজ্ঞানে খেলাম। বড় স্বামীজীর উক্তি—"দাও দাও আমাকে আগে অমৃত দাও।" এই কথা উচ্চারণ করে তাঁর কী প্রসন্ন হাসি!

একবার বাজিতপুর আশ্রমে গুরু মহারাজ বলে গেলেন—"আমি বাইরে যাচ্ছি। তোমরা কুনিয়া ঘাটে ছাতা নিয়ে যাবে আমাকে আনতে।" বর্ষা নেমেছে। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য আমরা যাচ্ছি যাবো এরকম গড়িমসি করে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো গুরু-মহারাজ বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আসছেন। এধারে আমাদের তো ভয় হয়ে গেছে। তিনি মৃদু তিরস্কারের স্বরে বল্লেন—"তোদের আর কি বলবো! আজ থাকতো যদি সচ্চিদানন্দ তাকে কান ধরে উঠ্‌বোস করাতাম।" তাঁর উপর গুরু মহারাজের কী প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস!

কোলকাতায় বড় গরম। পূজ্য বড় স্বামীজীর কাছে একটা ছাতা কেনার জন্য কয়েকটা টাকা চাইতে গেলাম। বড় স্বামীজী বসে আছেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম প্রণাম করে। বড় স্বামীজী আমার মনের ইচ্ছা টের পেয়েছেন আগেই। আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—"কিরে কি দরকার?" আমি হেসে হেসে জানালাম—"আপনি বলে থাকেন বড়দের কাছে মাঝে মাঝে আসতে হয় এবং উপদেশ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য এসেছি।" উত্তরে বল্লেন—"আসল ব্যাপারটা কি খুলেই বল না বাবা।" আবার তিনি হেসে হেসে বলছেন—

"মানুষকে তো তুমি কত উপদেশ দাও, আমি কি উপদেশ দেবো বাবা, বল তো দেখি আসল কথা!" তার উত্তরে জানালাম—"গরমকালে একটা ছাতার প্রয়োজন। মাত্র পনের-কুড়ি টাকা দিলেই হবে।" হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছেন—"আমি কি একসঙ্গে জীবনে পনের কুড়ি টাকা দেখেছি? আচ্ছা, তোমার আবার ছাতার কি দরকার? দিব্যি তো গৌরাঙ্গের মত চুল বানিয়েছো। চুলই তো ছাতার কাজ করবে! বেশতো জল গড়িয়ে পড়বে, বেশ মানাবে। ছাতার দরকার কি?" অবশ্য ছাতা কেনার জন্য পরে দশ টাকা পাওয়া গেল। চমৎকার তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষাদানের কৌশল!

তাঁর ত্যাগ, সংযম ও সাধনা জাতির মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর মনের গভীরতা সমুদ্রতুল্য! অনন্ত আকাশের ন্যায় তাঁর হৃদয়! তাঁর তুলনা তিনি স্বয়ং। হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর উন্নত শির। শ্রীগুরুর কৃপায় শংকর, চৈতন্য ও বুদ্ধের মত তাঁর বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রেম। তাঁকে যে একবার দেখেছে, তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, সকলে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। শুধু শিষ্যের কথা নয়, কত তৃষিত-তাপিত মানুষ তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে দৈনিক ভিড় জমাতো।

সন্ন্যাসী-সম্মেলনে গুরুজীর আসনের পাশে বসে সকলের মাথার মণি হয়ে থাকতেন। আজ সত্ত্ব-শরীরে অন্যান্য নরনারীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁর দিব্যমূর্ত্তির আসন প্রতিষ্ঠা হলো।

এই তো কয়েক দিন আগে আমার সঙ্গে জীবনের শেষ দেখা। জামসেদপুর ত্রিশূল উৎসবে যাচ্ছি। বালীগঞ্জ আশ্রমে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট আছেন বড় স্বামীজী। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালেন এবং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

গুরুজীর দেহত্যাগের পর পূজ্য বড় স্বামীজী আমাদের মা-বাবা, বন্ধু-সখা সব কিছু হয়ে ছিলেন। টাকা পয়সা চাইতে গেলে যাতে বেশী খরচ না করি সে বিষয় সব সময় সজাগ করে বলতেন,—"গ্যাখ্, প্রেমানন্দ! অত বড় হাত করিস নে।"

ভারী একটা মজার কথা।

পুরীধামের আশ্রমে পূজ্য বেদানন্দজী আমার জন্য পঁচিশ টাকার স্লিপ্ লিখে দিচ্ছেন মেদিনীপুর গ্রামে প্রচারে যাওয়ার খরচের জন্য। সে সময় দোতলা ঘরের বারান্দায় আমাদের স্লিপ লওয়ার দৃশ্য বড় স্বামীজী দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন। টাকা তো দিবেন তিনি। স্লিপ্ নিয়ে যেই শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর চোখে চোখ পড়েছি, অমনি তিনি হেসে বল্লেন—"বাবা, ন-ন-ন নমস্কার!" যেমন তিনি গম্ভীর, তেমনি ছিলেন রসজ্ঞ!

গুরুমহারাজ যেরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতির আসনে বসে সকলের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ ভাবে বড় স্বামীজীও অসুস্থ শরীর নিয়ে হাজার হাজার নর নারীকে অকুণ্ঠচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শন ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছেন জীবনের শেষ উপান্তেও।

মহৎ-সংস্মরণ

ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

আমরা স্মরণ করি তখনই যখন কিছু হারাই। যা আমাদের কাছ থেকে সরে যায়, চলে যায় কালপ্রবাহে, তা যেমন জানিয়ে দেয় জীবনে সব কিছুই অস্থির ক্ষণভঙ্গুর, চিরচঞ্চল, তেমনই স্মৃতি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে কিছুই হারায় না,তা সঞ্চিত থেকেই যায় অক্ষয় সম্পদরূপে আমাদের মনের মণিকোঠায়। বিশেষ করে যাঁকে হারাই তিনি যদি কোনও মহৎ জন হ'ন, তা হলে তো কিছু হারানোর প্রশ্নই আসে না, কারণ তাঁদের প্রেরণা সকলের মনে চিরদিনই সমানভাবে কাজ করে যায়।

এ-সব কথাগুলি বিশেষভাবে মনে আসছে যাঁকে আমরা সম্প্রতি হারিয়েছি সেই পূজ্যপাদ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ, যাঁকে সবাই বড় স্বামীজী বলেই জানতেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্ণধাররূপে, তাঁরই প্রসঙ্গে। পরিণত বয়সে জীবনের আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে দেহকে যেন তিনি পূর্ণাহুতি দিয়ে গেলেন। সে-ব্রত ছিল সেবা, ভারতের অগণিত জনগণের সেবা, জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ, পীড়িত, আর্তের সেবা এবং এই সেবাধর্মে তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর গুরু আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ।

স্বল্পপরিসর জীবনে গুরু তদীয় মহাসঙ্ঘের ভাবাদর্শ ও কর্মধারাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে যান। তাঁর প্রতিভাধর উত্তর সাধকেরা সেই সঙ্ঘের সেবাকর্মের পরিধি যারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করেন, আর এই কার্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্যের অভিন্নহৃদয় শিষ্য পূজ্য বড় স্বামীজী। গুরুশক্তিই তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। কী অবিচল নিষ্ঠায় ও পরম মমতায় তিনি এই তাঁর সদ্‌গুরুস্থাপিত এই সঙ্ঘটিকে লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট করে গেলেন দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, তা এক অতুলনীয় ইতিহাস। সকলকে একত্রিত করে বেঁধে রাখাই তো এক দুরূহ সমস্যা, তার উপর ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা তার চেয়েও আরও এক জটিল সমস্যা। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধ, সরলতা এবং একান্ত আন্তরিক মমতার সমাবেশে। আজ যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের গৌরব বর্ধন করছে এর পিছনে এই বড় স্বামীজীর যে কত প্রাণপাত পরিশ্রম ও জীবন-উৎসর্গ-কারী অবদান, তা হয়তো অনেকেরই অগোচর থেকে গিয়েছে।

এই অগোচর থেকে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ তিনি বড় স্বামীজী হয়েই কোন দিন নিজেকে বড় ক'রে সকলের সামনে তুলে ধরেন নি। এই আত্মপ্রচারবিমুখীনতাই তাঁকে আদর্শ সন্ন্যাসী করে তুলেছিল। সমস্ত কাজই নিঃশব্দে অন্তরালে থেকে ক'রে গিয়েছিলেন। সকলকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, সংগঠিত করে বিভিন্ন সেবাক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন, নিখুঁতভাবে কর্ম সম্পাদন করতে শিখিয়েছেন কিন্তু নিজেকে কখনও পাদপ্রদীপের সামনে আনেন নি। শুধু পরম মমতায় স্নেহে ঘিরে রেখেছেন প্রত্যেকটি কর্মী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে।

তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি, তখনই তাঁর পদপান্তে বসে এই উপলব্ধি নিয়েই ফিরেছি ইনি আমার একান্ত আপন জন, আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও নিকটতম। পরিচয়ও পেয়েছি তার বারংবার। স্বহস্তে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ লিখে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন 'সঙ্ঘগীতা' আমাকে সৎকর্মে ও সদ্‌ধর্মে প্রেরণা জোগাবার জন্য, আবার যখন গুরুতর অসুস্থ হয়েছি তখন পরম মমতাময়ী জননীর মতো আমার দৈহিক দুর্বলতা দূর করার জন্য নিজের সেবককে দিয়ে নানা ফলমূল, পুষ্টিকর খাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রপাঠে তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল এবং এই শাস্ত্রপ্রচারে যেন আমি সর্বদা ব্রতী থাকি সেজন্য সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন ও অমোঘ আশীর্বাদে ধন্য করেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে শ্রীনাথ হলে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সমেত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আলোচনা তাঁরই

প্রেরণায় সম্ভব হয়েছিল এবং এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার যে যেদিন সন্ধ্যায় এই গীতাপাঠ সম্পূর্ণ হল, সেদিনই তিনি তাঁর নশ্বর দেহ তার একঘণ্টা পরেই ত্যাগ করে চলে গেলেন। যেন এরই প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন, পূর্ণাঙ্গ গীতা-আলোচনার শেষেই তিনি বিদায় নেবেন বলে স্থির ক'রে রেখেছিলেন।

তাঁর পুণ্য জীবনের নানা সংস্মরণে তাই হৃদয় পবিত্র হয়। এঁদের মতো মহতের জন্মেই ভারতবর্ষ আজও পুণ্যভূমি হয়ে আছে, কারণ এঁরাই 'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি', সমস্ত তীর্থকে তীর্থ করেন, পবিত্র করেন আপন জীবন ও আচরণের দ্বারা তাই তাঁর সংস্মরণে আমরা যেন তীর্থদর্শন বা তীর্থস্নানের ফল লাভ করি। সেই অমর আত্মার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি অলক্ষ্যে থেকেও এই সঙ্ঘটিকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং তাঁরই আদর্শ অনুসরণে আমাদের সকলকে শক্তি দান করেন।

শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের ব্যবহারিক জীবন

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

১৯৪৫ সাল থেকে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব সময়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ে থেকে পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে অতি নিকট থেকে দেখার ও পবিত্র সাহচর্য লাভের অপূর্ব সুযোগ পেয়ে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে যা দেখেছি, সে সম্পর্কে কিছু নিবেদন করবো।

তখন ব্রহ্মচর্য সংস্কারপ্রাপ্ত হওয়ার পর সঙ্ঘ-সন্তানদের প্রধান কার্যালয়ে ২।১ বছরের জন্য শ্রীগুরুমন্দিরের মার্জনা, পূজা-আরতির জোগাড়, ভোগপাক, ভোগনিবেদন, পরিবেশন, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অক্ষম ও অসুস্থ সন্ন্যাসীদের সেবা পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত রাখা হ'ত। সে সময় দেখেছি পূজনীয় শ্রীমৎ বড় স্বামীজী সর্বাগ্রে রাত ৩টায় শ্রীগুরু মন্দিরে এসে করতাল বাজিয়ে 'দিনমপি রজনী সায়ংপ্রাতঃ' বা মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমূলক ও গুরুশরণাগতি মূলক গানগুলি আবেগের সঙ্গে একা একা গেয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গল আরতির পর শ্রীগুরুবিশ্রাম মন্দিরে গিয়ে স্বীয় আসনে উপবেশন করে সকল সঙ্ঘ-সন্তানকে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। ত্রিসন্ধ্যা আরাত্রিকের পর তিনি তা করতেন, এবং নিত্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আরাত্রিকে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সায়ংকালে আরতির পর ভোগ নিবেদন করা হ'ত। পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী তালপাতার পাখাখানা নিয়ে শ্রীগুরু আসনে মনপ্রাণ ঢেলে ব্যজন করতেন। প্রাতঃকালীন আরতির পর ভোগ দেওয়া হত দই, চিড়া, মুড়ি মিষ্টি ইত্যাদি। বাজার থেকে মুড়ি চিড়ার ঠোঙাগুলি এক রকম সরু পাটের সুতলি দিয়ে জড়ানো থাকত। ভোগ নিবেদনের শেষে ঐ পরিত্যক্ত সুতলিগুলি নিজ হাতে সংগ্রহ করে তাল পাকিয়ে রাখতেন; টাকা গুণে বাণ্ডিল করার সময় ঐ সুতলিগুলি ব্যবহার করা হত। এভাবে কিছু পয়সার সাশ্রয় হ'ত। বলতেন, "কোন জিনিস ফেলা যায় না। যাকে রাখো সেই রাখে।"

দ্বিপ্রহরে ভোগ দেওয়ার পর কয়েকটি বড় বড় বাটিতে ভোগের অন্ন ব্যঞ্জনাদি একটি র‍্যাকে তুলে রাখতে বলতেন। কি জিনিস কতখানি রাখতে হবে তাও বলে দিতেন। যে সমস্ত সঙ্ঘ-সন্তান দৈনন্দিন চাঁদা আদায়ের পর একটু দেরীতে ফিরত বা বহিরাগত সন্ন্যাসী বা কর্মী অসময়ে এসে পড়তো ঐ সব তুলে-রাখা ভোগের প্রসাদ দেওয়া হত তাদের।

প্রতিদিনের ভোগের বাজার ও সর্বসাধারণের পাকের জন্য বাজার করার সময় তিনি নিজ হাতে জিনিসের তালিকা তৈরী করে হিসাব মত টাকা পয়সা দিতেন। বাজার থেকে ফিরে এলে হিসাব বুঝে নিতেন। চার পয়সা উদ্বৃত্ত হলেও তা ফেরৎ নিয়ে বলতেন— প্রতিদিন চার আনা বাঁচলে মাসে সাড়ে সাত টাকা, বছরে ১০০ টাকা সাশ্রয় হয়। এভাবে এক শত ভাই চেষ্টা করলে-

বছরে হাজার টাকা সাশ্রয়। তা দিয়ে অনেক কাজ হয়। ভোগের জন্য যদি কোন ভক্ত কাঁচা তরকারী আনত, তবে বাজার করার সময় সেগুলির খোঁজ নিতেন এবং সেই হিসাবে বাজারের টাকা দিতেন। ফলমূলাদি কোনও ভোজ্য দ্রব্য এলে শ্রীগুরুর ভোগ না দিয়ে গ্রহণ করতেন না! কোন্ দিন কি রান্না হবে সে তালিকা করে হিসাব মত টাকা দিতেন।

সেবার ঝাড়গ্রামে আশ্রমের জমিতে প্রচুর মিষ্টি কুমড়ার চাষ হয়েছিল। এক একটির ওজন ১৫।২০ সের। ৫টি কুমড়া বস্তায় করে এনে পূজনীয় বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে নিয়ে দেখালাম। মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে দত্ত মশায়ের তারিফ করে বললেন—"অবাক্ কাণ্ড! কাঁকর বালির শুকনা মরুভূমির মত মাটি:ত এগুলি ফলিয়েছে?" হাত বুলিয়ে দেখে বললেন, "শ্রীগুরু বিশ্রামমন্দিরে নিয়ে রাখ। ঠাকুরের ভোগ হবে।"

১৯৫০।৫১ সালের কথা। পূজনীয় বড় স্বামীজীকে ডালহাউসী স্কয়ারে একদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অফিসে যেতে হয়েছিল। গরমের সময়! সম্ভবত মে মাস। সেবককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরে প্রচণ্ড রোদ। গেটের বাইরে এসে ট্যাক্সি আনার জন্য অনুমতি চাইলাম। বললেন, "এগিয়ে চল।" ট্রাম টারমিনাসে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে শেষের আসনে বসলেন এবং কৃপা করে নিজের পাশে এই নগণ্য সেবককে বসালেন। আমি সঙ্ঘের পরম পূজ্য সভাপতির এরূপ কাজ দেখে অবাক্ হয়ে ভাবছি। ট্যাক্সিতে না গিয়ে কেন ট্রামে উঠলেন নানা ঝুঁকি নিয়ে। বললেন, "দুপুরের গাড়ীতে বেশী ভীড় হবে না। শোভাবাজার বাগবাজার থেকে, মির্জাপুর থেকে সে সময় হেঁটে এসে বালিগঞ্জে চাঁদা আদায় করেছেন স্বামীজীরা। ট্রাম ভাড়া সাশ্রয় হ'ত। সে দিনের কথা চিন্তা করলে আর ট্যাক্সিতে ৪।৫ টাকা খরচ করতে গায়ে লাগে।" সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার সুরুতে ট্রেনে, ষ্টীমারে এবং কলকাতায় ট্রামে বাসে বক্স কলেকসনে টাকা সংগ্রহের কথা শুনিয়ে কিভাবে তিলে তিলে সঙ্ঘকে গড়ে তুলেছিলেন তা বলতে লাগলেন।

বাজিতপুর থেকে একবার কলকাতায় আসার পর পয়সার অভাবে শিয়ালদা থেকে কিভাবে হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জের আশ্রমে পৌঁছেছিলেন তাও বললেন। সেদিন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ৩।৪ জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর হাতেও সেদিন টাকা ছিল না। কলকাতায় এসে স্বামী আত্মানন্দজীর থেকে টাকা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। আর সঙ্ঘের সহ-সভাপতি বড় স্বামীজী গুরু মহারাজের নির্দেশে হেঁটে হেঁটে এসেছিলেন। বললেন, "তিনি যা করিয়েছেন, তাই করেছি; আজও তা করে যাচ্ছি।" মহাজীবনের এ শিক্ষা বিরল। অকপটে সব কথাই বলে গেলেন নগণ্য সেবকের শিক্ষার জন্য।

প্রতি বছর বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে আমরা সদলবলে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব পালনের জন্য যেতাম। পূজ্য বড় স্বামীজী সকল সঙ্ঘ-সন্তানকে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনে একত্রে গেছেন। প্রবীণ সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের জন্য ২।৩ খানা ইণ্টার ক্লাস টিকেট কেনা হত। কিন্তু বড় স্বামীজী আমাদের সকলের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতেই গেছেন। গাড়ীর মধ্যে পূজা-প্রার্থনা হয়েছে। নিজ হাতে প্রসাদ দিয়েছেন। আনন্দের হাট বসিয়ে মহাতীর্থে যাত্রা হ'ত। ষ্টীমারের কেবিন রিজার্ভ থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গেই যেতেন একত্র হয়ে। খুলনায় ট্রেন থেকে মালপত্র নামানো হ'ত। ষ্টীমারে মাল তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবক্ষণের সাথী দণ্ডটি ধারণ করে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন মালগুলি আগলিয়ে। আবার কলকাতায় ফিরেও দেখেছি শেষ মালটি না উঠা পর্যন্ত একই ভাবে দণ্ডের উপর ভর দিয়ে মাল আগলিয়ে আছেন।

কাশীতে দুর্গোৎসবে বা গয়ায় পিতৃপক্ষ মেলায় অথবা পুরীতে রথযাত্রা মেলায় যাওয়ার সময় এবং ফেরার সময় ঐ একই ভাবে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে দেখেছি একই সাথে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে। ঐ একই ভাবে এক শত সোয়া শত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কর্মীর মালপত্র আগলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। শেষ পর্য্যায়ে ২।৪টি ভারী মাল নেবার জন্য কুলি নেওয়া হত। কুলির সঙ্গে দরদামও নিজেই ঠিক করতেন।

তখন শ্রীগুরুমন্দিরে ভোগের পর দোতলার হলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, কর্মিগণ দ্বিপ্রহর ও রাত্রের খাওয়ার খেতেন।

পূজ্য বড় স্বামীজী, শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীজী, শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ প্রথম ব্যাচে একত্র বসে খেতেন। খাওয়ার পর শ্রীমৎ বড় স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার ভাত লাগবে, কার ডাল লাগবে, কার তরকারী লাগবে, কাকে জল দিতে হবে, কাকে নুন দিতে হবে এবং কে কখন খেতে বসবে, কে কে কখন পরিবেশন করবে সব নির্দেশ দিতেন। খাওয়ার সময় নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশন গড়ে উঠত।

বলতেন "লক্ষ্মীটি! পরিমাণ মত দাও! জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও।" ডেলা পাকানো ভাত গুলো ভেঙ্গে দিতে বলতেন। ডেলা সমেত দিলে অতিরিক্ত ভাত পড়ে পাছে নষ্ট হয়, সে কথাও বলতেন। সে সময়ে ব্যক্তিগত থালা ঘটি বাটি ছিল না। ১৫।২০ খানা কলাই-করা থালা, একটি এলুমিনিয়মের ঘটি। ঐ বাসনে বড় বড় স্বামীজীদের থেকে আরম্ভ করে সামান্য সেবক কর্মীটি পর্যন্ত পানাহার করত। তখন উৎসব ছাড়া বাজার থেকে কলাপাতা বা শালপাতা এনে খাওয়ানো হত না। রাত্রের ভাত ডাল যা বাঁচত সকালে সন্ন্যাসীরা তাতেই প্রাতঃকালীন জলযোগ করে কাজে বেরিয়ে পড়ত। পৃথক্ ভাবে জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল না। ২।৪ জন বয়স্ক সন্ন্যাসী বা যারা অসুস্থ তাদের জন্য প্রয়োজন হোলে চিড়ে বা মুড়ির ব্যবস্থা করা হ'ত। সবই পূজ্য বড় স্বামীজী নিজে তদারকি করতেন। কে কে খেতে বাকী থাকল, তার কথা চিন্তা করতেন।

একবার মন্দিরের পূজা আরতির পাদুকা মোছার তোয়ালেটির মলিন অবস্থা দেখে সেটিকে পাচিলের বাইরে ফেলে দিই। একটি নতুন তোয়ালে কেনার আবেদন নিয়ে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর নিকট আট আনা পয়সা চেয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, "গুরু মহারাজের নিত্যপূজা আরতির ঐ তোয়ালে ফেলে দিতে নাই। সোডা দিয়ে একটু কেচে নিলে আরও কিছুদিন চলবে।" আমি তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করে ঐ ফেলা-দেওয়া তোয়ালের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

একদিন গরমের সময় দুপুরের পর শ্রীগুরুমন্দিরে ফল, মিষ্টি ও বেলপানা ভোগ দেওয়ার সময় বিশ্রাম মন্দিরে গিয়েছি মেজের উপর পাতা পাটিতে বালিশ তোয়ালে, ঢাকা-দেওয়া গ্লাসে জল। পাটির উপর শ্রীগুরুমূর্তি স্থাপিত। পূজনীয় বড় স্বামীজী পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন তন্ময় হয়ে। আমাকে দেখে চার আনা পয়সা দিয়ে বরফ আনতে বললেন।

বেলপানার সঙ্গে বরফ দিয়ে ভোগ দেওয়া হ'ল। বিশ্রাম মন্দিরে বসে সকলকে নিজ হাতে প্রসাদ তুলে দিয়েছেন সন্তান বাৎসল্যে।

মাঘী পূর্ণিমার সময় বাজিতপুর উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য কাশী থেকে শ্রীমৎ মুক্তানন্দজী, গয়া থেকে শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দজী, গুজরাট থেকে শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজীও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যা-সীরা কলকাতায় আসতেন। সে সময় বড় বড় স্বামীজীদের পৃথক্ বিশ্রামকক্ষ ছিল না। পূজনীয় শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে মেজের উপর বিছানা পেতে ৩.৪ জন এক সঙ্গে থাকতেন। খাট, বা তক্তাপোষ ছিল না। মাদুর সতরঞ্চি কম্বল পেতে বিছানা। পূজনীয় বড় স্বামীজী সঙ্ঘ-সভাপতি— তিনি সঙ্ঘ-ভ্রাতাদের স্থান দিয়েছেন নিজকক্ষে। আহার করেছেন শ্রীগুরুপাদমূলে বসে একসঙ্গে। সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির সভার দিন গৃহী সদস্যদের বসিয়ে শ্রীগুরুপ্রসাদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হ'ত বিছানাগুলি গুটিয়ে পূজ্য বড় স্বামীজীর বিশ্রামকক্ষে।

পূজনীয় বড় স্বামীজী ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতেন না, দোয়াত কলমে লিখতেন। প্রত্যেকটি চিঠির জবাব নিজ হাতে দিতেন। দুপুরের পর ডায়রী লিখতেন। সঙ্ঘবাণী, সঙ্ঘগীতা ও শ্রীমদ্ভগবত গীতা ছিল নিত্য পাঠ্য। শঙ্করাচার্য গ্রন্থাবলী, বিবেক চূড়ামণি, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ পাঠ তাঁর স্বাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাত্রে আহারাদির পর মহাভারত ও রামায়ণ থেকে সুর করে পাঠ করে শোনাতেন স্বামী নিখিলানন্দজী। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী সম্বিদানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজা, স্বামী পরমাত্মানন্দ-জীকে মাঝে রামায়ণ পাঠ করে শোনাবার আদেশ করেছেন এই নগণ্য সেবকের উপর কৃপা করেও মাঝে মাঝে পাঠের আদেশ করেছেন। রামায়ণ বা মহাভারত পাঠের পর সঙ্ঘ-গীতার কয়েকটি পত্র পঠিত হ'ত। স্বামী ভূমানন্দজী বা স্বামী সম্বিদানন্দজী গুরুশরণাগতি ও বৈরাগ্যমূলক গান—যেমন

'যে পথে মুক্তি মিলে গুরু দেন বলে,' বা 'এ মায়া প্রপঞ্চময়'—অথবা 'কাপড়খানি শিরে পায়'—ইত্যাদি গান করে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে শুনাতেন। ৮।১০ জন অন্তরঙ্গ শ্রোতৃ থাকতেন। পাঠ ও গানের পর বলতেন "যাও, সকলে বিশ্রাম কর।" তৎপূর্বে ঠাকুরের শয়ন দেওয়া হত। নিজে গিয়ে শ্রীগুরু বিশ্রামমন্দিরে ও নিত্য পুজামন্দিরে এসে প্রণাম করে শয্যাগ্রহণ করতেন। ইলেকট্রিক পাখা ব্যবহার করতেন না। তাঁর ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালানো হত না। লণ্ঠন প্রস্তুত থাকত। সরষের তেলের সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত রাত্রে পাঠের সময়। বলতেন "ইলেট্রিক পাখার হাওয়া ও বিদ্যুতের আলো স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। পাখা আলো নিয়ন্ত্রিত হলে খরচও কম হয়।"

রাত্রে পাঠের সময় অনেক সময় শিশুর মত সরলতা নিয়ে শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী পুজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীকে পাখার হাওয়া করতেন। যে কোন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য শ্রীমৎ যোগানন্দজী, শ্রীমৎ বেদানন্দজী, শ্রীমৎ বিজ্ঞানান্দজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীরা হেড্ অফিসে উপস্থিত থাকলে একত্র বসে স্থির করতেন পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর বিশ্রাম কক্ষে।

তখন সংবাদপত্রে সঙ্ঘের খবর বের হলে পূজ্য বড় স্বামীজী ৫০।৬০ খানা আনিয়ে প্রচারক দলে ও আশ্রমে আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। একদিন গরমের সময় দেখা গেল শ্রীমৎ বড় স্বামীজী খবর কাগজ থেকে সঙ্ঘের সংবাদগুলি কেটে কেটে খাতায় আঠা দিয়ে লাগাচ্ছেন। গরমে গলদ্ঘর্ম। বাম হাতে দু'একবার পাখার বাতাস নিচ্ছেন। আমি ঘরে গিয়ে পাখা খানা হাতে নিয়েছি। বললেন—"বিশ্রাম মন্দিরে কেউ নাই, বড় গরম। সেখানে গিয়ে একটু হাওয়া দাও।" শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কথা উল্লেখ করে আরও বললেন "কাগজে সংবাদ দেওয়া, সংবাদ সংগ্রহ করে কাটিং রাখার বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। রাসবিহারী বাবুকে দিয়ে এ সব নিজে করাতেন। বিশাল গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,সত্যেন মজুমদার মতিলাল ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঘা বাঘা সাংবাদিক ও এডিটরদের সঙ্ঘের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অকাট্য যুক্তি দিয়ে তাদের কনভিন্স্ করেছেন। পিছনে একদিকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখতাম শুনতাম।"

পুজ্য বড় স্বামীজীর আদেশে রিপোর্ট লিখে খবর কাগজের অফিসে বহু বছর যাতায়াত করেছি। রিপোর্ট তৈরী করে তাঁকে দেখালে উপযুক্ত কোন্ শব্দটি কোথায় বসালে ভাল হয়, তারও নির্দেশ দিতেন। কাশীতে দুর্গোৎসবের সময় স্থানীয় সংবাদপত্রে উৎসবের রিপোর্ট প্রকাশ করার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেন। বিভিন্ন স্থানে সাময়িক সেবাকেন্দ্রে চিঠি লিখে স্থানীয় সাংবাদিকদের মারফৎ কলকাতার কাগজগুলিতে সংবাদ পাঠানোয় নির্দেশ দিতেন। সংবাদ বের হলে তা দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সংবাদপত্রে প্রচারের আগ্রহ বিষয়ের উল্লেখ করে অনুপ্রেরণা জোগাতেন।

সুদীর্ঘকালের কত কথাই না মনে পড়ে। স্বাস্থ্যের জন্য ডাঃ নরেশ ভট্টাচার্যের পরামর্শে তিনি প্রায়ই ঝাড়গ্রামে গিয়ে ২।৩ সপ্তাহ থেকে আসতেন। যখন নিজস্ব আশ্রম হয়নি, তখন পুকুরিয়ার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে শাল, মহুয়া, কাজুবাদাম জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার বাবুর খালি বাংলো বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর শুভ প্রচেষ্টায় পুকুরিয়ায় আদিবাসী কল্যাণকেন্দ্র গড়ে উঠল। সেখানে দোলে উৎসব প্রবর্তন করলেন। নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তুললেন, পরে পরে ওদিকে কার্যের বিরাট প্রসার লাভ করল।

ঝাড়গ্রামের মহারাজা ১৮ বিঘা জমির উপর পিয়ারা বাগান সহ তাঁদের কাছারী বাড়ী মাটি-খড়ের ঘর সঙ্ঘের কর্মবিস্তারের জন্য দান করলেন। সেই খড়ের ঘরটিতে গিয়ে তিনি থাকতেন। মহুয়া তেলের প্রদীপ জ্বলত শ্রীগুরুমন্দিরে। সেই অন্ধকার ঘরে একদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন করে ত্রিসন্ধ্যা পূজা-প্রার্থনা, ভোগ-নিবেদন হ'ত। আমরা সবাই বারান্দায় থাকতাম। আমাদের পাঠাতেন সাঁওতাল পল্লীতে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে প্রচার, যজ্ঞ, মিটিং করার জন্য। দুবরাজপুর সাঁওতাল পল্লীতে গরুর গাড়ীতে করে নিজে প্রতিবারই গেছেন। তাদের আশীর্বাদ করেছেন। অভাব অভিযোগে কাপড় কম্বল দান করেছেন। ভালবেসে আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাতৃস্নেহে পেট ভরে খাইতেছেন ঐ সব দুঃস্থ, অনুন্নত, অজ্ঞ মানুষ-জনদের।

সেবার তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখা গেল। পুকুরিয়া আশ্রম থেকে কলকাতা রওনা হওয়ার ২।৩ মিনিট পরে মুষলধারে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি আরম্ভ হল। মেটে রাস্তা উঁচু নীচুর জন্য রিক্সাগুলিকে আমরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। মহাদুর্যোগে আশ্রমে ফিরে যাওয়ার জন্য স্বামী নিখিলানন্দজী প্রস্তাব করলেন। শ্রীমৎ স্বামীজী বললেন, "না—যখন সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছি, ফিরব না।" কিছু দূরে নরেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে পোষ্ট অফিসের সংকীর্ণ বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হল। ১ ঘণ্টা পর বৃষ্টি বন্ধ হলে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলেন। বললেন, "গুরুমহারাজ সঙ্কল্প রক্ষার উপর খুব জোর দিতেন। সঙ্কল্প থেকে কোনও ভাবে বিচ্যুৎ হতে নাই।"

১৯৫২ সালে ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দিরে ধর্মশাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। প্রতি শনিবার ও রবিবার সপ্তাহে দু'দিন করে সভা বসত। বিরাট হলটি পরিষ্কার করার আলাদা লোক থাকতো না। একদিন ঝাড়ু নিয়ে হলঘরটি পরিষ্কার করছিলাম। সকালের দিকে শ্রীমৎ বড় স্বামীজী প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে ঐ বাড়ীতে গেছেন, সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। পেছন ফিরে তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। প্রণাম করতেই বললেন, "পুরীতে গুণ্ডিচা বাড়ীতে কবুতরের মলে স্তূপীকৃত আবর্জনা জমে থাকতে দেখে মহাপ্রভু সম্মার্জনী হস্তে ঐ ময়লা অপসারণ করেছিলেন। এতে মান অভিমান নষ্ট হয়। হৃদয়ের মালিন্য কেটে যায়। প্রয়োজনে যেমন অফিসের কাজ করতে হয়, শ্রীগুরুমন্দির মর্জনার ভিতরও অশেষ কল্যাণ।" একদিন অবাক্ হয়ে দেখলাম শ্রীগুরুমন্দিরের সামনের বারান্দায় শ্রীমৎ বড় স্বামীজী নিজে ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করছেন।

বছর তিনেক আগে এক রাতের ঝড়ে কলকাতা আশ্রমের আমগাছটি রাস্তার উপর পড়ে। বাইরে যাওয়ায় জন্য মাথা নীচু করে গাছের তলা দিয়ে যেতে হ'ত। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। ভ্রমণসঙ্গী কানহাইয়া লাল (স্বামী হংসেশ্বরানন্দ) পূজনীয় বড় স্বামীজীকে মাথা নীচু করে গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছে। ৫।৭ সেকেণ্ড স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে গাছটির যেখানে মূল উপড়ে গেছে, সে দিক দিয়ে মাথা উঁচু করে পেরিয়ে গেলেন এবং বললেন, "জীবনে এক জনের কাছে মাথা নীচু করেছি। অন্য কারু কাছে মাথা নীচু করব না,—বলেই মধুর হাসি। সেই সরলতা মাথা মিষ্টি হাসির রেশ আজও চাখের সামনে ভাসছে।

স্বামী সচ্চিদানন্দ স্মরণে

শ্রীসুধাংশু ভূষণ নায়ক

সৎ-চিৎ-আনন্দ, তুমি হইলে বিলীন
গুণমুগ্ধ ভক্তজন আঁখিজল ফেলে নিশিদিন ॥
তোমার বিরহে যবে যন্ত্রণাকাতর।
উৎকর্ণ শুনিতে তব যাদু কণ্ঠস্বর ॥

কেন ত্যাগ কেন আশা কেন ভালবাসা।
জীবনেতে তব কিছু ছিল না প্রত্যাশা ॥
যুগাচার্য্য সাথে তব সুকাঠোর শ্রম।
অসামান্য ত্যাগে সৃষ্ট হ'ল সেবাশ্রম ॥

বিশ্বেতে ছড়িয়ে দিলে আশা ও ভরসা।
কোটী কণ্ঠে তোমাদের বন্দনার ভাষা ॥
তোমরাই বারে বারে আসো ভূমণ্ডলে।
অমৃত করিয়া নাও সুতীব্র গরলে ॥

সে অমৃতকুম্ভমেলায়' সেবাশ্রম বিতরিছে সুধা।
সে প্রসাদ লভি ধন্য পরিপূর্ণ হয়েছে বসুধা ॥
স্বর্গে স্বর্ণ সিংহাসনে নিয়েছো বিশ্রাম।
দীনহীন অভাজন শ্রীচরণে জানায় প্রণাম ॥

'প্রিয় প্রাণারাম'

ডঃ সুবেশ কুমার কুইতি

পৃথ্বীর হিতৈষণায় যাঁরা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর অন্তরঙ্গ সহচর হয়ে আত্মমোক্ষ ও বিশ্বকল্যাণের আদর্শ জীবনসাফল্য লাভে ব্রতনিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ। তিনি ছিলেন আমার জীবনের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু। তাঁর মহাপ্রয়াণে অন্য সকলের ন্যায় আমার চিত্তও শোকাভিভূত। পরম প্রিয় প্রাণারাম গুরুদেব সম্পর্কে এই দীন সন্তানের কীই বা বলার থাকতে পারে ?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগে আমার আবাল্য সংযোগ। ১৯৭০ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গড়িয়া সেবাশ্রমে যোগদান করি। আশ্রমে আসার ক'দিনের মধ্যেই একদিন অতি প্রত্যূষে সকলের মধ্যেই চঞ্চলতা ও তৎপরতা। শুনলাম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ (শ্রীমৎ বড় স্বামীজী) আসবেন। এক ব্রহ্মচারী তাঁর সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বললেন। আমি তখন সবে মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছি। ১৬-১৭ বছরের কিশোর। শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর শুভাগমন বার্তা শ্রবণ করে মনে এল দারুণ উৎসাহ।

ঠিক তখন সকাল ৭টা। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ তিন-চারজন সন্ন্যাসী সমভিব্যবহারে প্রবেশ করলেন আশ্রমের গুরুমন্দিরে। আত্মভাবস্থ পরম তাপস মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর স্বভাব-গম্ভীর রমণীয় মূর্তি আমাকে বিশেভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নিমেষেই মন-প্রাণ ভরে উঠে। শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন কালে স্বামী ওঁকারানন্দজী আমার নামসহ পরিচয় দিলেন। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— 'ওর সংস্কার ভাল'।

কদিন পরেই প্রধান কার্যালয়ে শ্রীগুরুমন্দিরের উত্তর অলিন্দের সঙ্কীর্ণ গলিতে বসে 'যুগাচার্য সঙ্গ ও উপদেশামৃত' গ্রন্থটি পড়ছিলাম। ঐ পুস্তকে বর্ণিত শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর আবাল্য ত্যাগ ও তপস্যার পরিচয় পেয়ে আমি কেবলই তাঁর আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। ঐ দিন শ্রীমৎ বড় স্বামীজী যুগাচার্য শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দের সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করলেন। দূর থেকে আমি সব কিছু দেখে স্তম্ভিত। ওঁকার জয় গুরু ওঁকার জয় শিব ওঁ – সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের সমবেত সঙ্গীত তানে নিমেষেই মন চলে কোন্ দ্যুলোকে। শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর জলদগম্ভীর মূর্তি ও আরতির মধ্য দিয়ে সম্যক্ আত্ম-সমর্পণের প্রত্যক্ষ নিদর্শনে মনপ্রাণ নিমগ্ন হল অধ্যাত্ম সাধনায়। কি কিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়? কি উপায়ে মনঃসংযম করা সম্ভব ? এরূপ প্রশ্ন মনকে উদ্বিগ্ন করল ক্ষণকাল। সমাধানের পথ অন্বেষণে ব্যাকুল হল চিত্ত। সান্ধ্যারতির পরেই শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর ঘরে প্রণতির উদ্দেশ্যে গিয়েছি। জনৈক সন্ন্যাসীকে তিনি ধ্যানের বিষয়েই উপদেশ দান করছেন—'হৃদয়ে গুরুমূর্তি ধ্যান করতে হয়'। একথা শ্রবণমাত্রই মনে মনে ভাবলাম—আমার প্রশ্ন করার পূর্বেই তিনি উত্তর দিয়ে দিলেন।

কয়েক মাস পরেই আমার জীবনে এল বিপর্যয়। বাড়ী থেকে আমায় নিয়ে যাবার জন্য জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা এলেন। আশ্রমের ভাবাদর্শের আবেষ্টনীতে আমি তখন এমন ভাবে বাঁধা পড়ে গেছি যে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার পিতার আত্যন্তিক অনুরোধে স্বামী ওঁকারানন্দজী আমায় বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে চলেছি।

ট্রেনে ওঠা মাত্রই আমি যেন হঠাৎ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজীর (বড় স্বামীজী) শ্রীমূর্তি মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। সেই অনুভবের শক্তি এত বেশী ছিল যে আমি বাড়ী যেতে আর পারলাম না। পরের স্টেশন সোনারপুরে গাড়ী পৌছানোর একটু আগেই ধীরগতি ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে আমি নেমে পড়ি। এবং সেখান থেকে

পদব্রজে আবার গড়িয়া আশ্রমে উপস্থিত হই। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান।

ঐ বছর জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্ন সমাগত। স্বামীজীর নির্দেশ—'আজই দীক্ষা নাও'। আমি এসব কিছুই বুঝি না। দীক্ষার জন্য কি কি নেব? প্রশ্ন করাতেই তিনি বললেন—'তুই আশ্রমের ছেলে, দীক্ষার জন্য তোর আবার কি লাগবে? এক ব্রহ্মচারী আমাকে প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন। শ্রীগুরুমন্দিরের দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় দীক্ষাপ্রার্থীদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। সর্বপ্রথমে ডাক পেয়ে ধীর নম্র চিত্তে প্রবেশ করলাম যথানির্দিষ্ট স্থানে। আমার নাম জিজ্ঞাসা করার পর শ্রীমৎ বড় স্বামীজী আমার ইষ্ট বা অভিলষিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করলেন। সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম আমার অন্তরের কথা; কর্ণে দিলেন একটি ধ্বনি—যা আমার জীবনমন্ত্ররূপে চির-কালের জন্য মর্মের মাঝে সংস্থিত হল। 'মননাৎ মন্ত্রঃ'—মনন করতে করতে যার মধ্য থেকে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ অনুভূত হয়, তা-ই মন্ত্র। বললেন তিনি—'এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা জপ করবে'। ব্রহ্মচর্য্যম্ ও সঙ্ঘবাণী হাতে দিয়ে বললেন—'এর প্রতিটি অক্ষর পবিত্র ব'লে জেনো'। আদেশ শিরোধার্য ক'রে পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদনান্তে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁরই শ্রীচরণ ভরসা ক'রে জীবনের বহু বিচিত্র পথে চলেছি। প্রতিবারেই দেখেছি, প্রণাম নিবেদন কালে ব্রহ্মরন্ধ্রে হস্তস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এক গভীর পুলকানুভূতি, মনের সবরকম সংশয়ের অবসান হয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে কোন দিন মুখ ফুটে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। কি ভাবে যে তিনি আমায় নিজের ক'রে নিয়ে আশীর্বাদ করতেন তা বুঝিয়ে বলার ভাষা অন্ততঃ আমার নেই।

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে

স্বামী কৈবল্যানন্দ

যুগের দেবতা প্রণবানন্দ
এই ধরাতলে আসি,
গড়িয়া তুলিল মহান সঙ্ঘ
ধন্য জগত-বাসী।
তুমি তাঁর ছিলে লীলা-সহচর
বিজয় পতাকাবাহী,
সেবা ও কর্মে, ত্যাগ-তপস্থায়
তোমার তুলনা নাহি।
হে বীর সাধক, সন্ন্যাসীবর
সচ্চিদানন্দ স্বামী,
সঙ্ঘ নেতার লোকহিত ব্রতে
তুমি ছিলে অনুগামী।
তোমার জীবনে মননে সাধনে
পালিলে গুরুর বাণী,
কর্ম্ম যাগের অনল শিখায়
নিজেরে আহুতি দানি।
সৎরূপে আছ নিখিলের মাঝে
হে সাধক মহীয়ান্,
চিৎরূপে সদা জ্ঞানের বিভায়
নিত্য জ্যোতিষ্মান্।
সৎ-চিৎ-ঘন আনন্দ রূপেতে
বিরাজিত সব ঠাই,
তুমি শুধু নাই নরকায়া ধরি'
তাই মনে ব্যথা পাই।
মোহের কালিমা ঘুচুক মোদের
যবনিকা যাক্ সরি,
তোমার জ্ঞানের দিব্য আলোকে
হৃদয় উঠুক ভরি।

পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর হস্তলিপির নমুনা

ওঁ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অমৃত পুরুষ স্বামী সচ্চিদানন্দ

ডঃ সত্যেন্দ্র দে

সমুদ্রসৈকতে জলের ভাষা বড়ো সোচ্চার, তরঙ্গের তাণ্ডব বড্ডো প্রত্যক্ষ। কিন্তু মধ্যসাগরে সাধারণত নিস্তরঙ্গ শান্তি, অনন্ত নীলিমা কারণ জল সেখানে অতলান্তিক। সর্বদা স্মিতভাষী, স্বল্পবাক্, অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর স্বামী সচ্চিদানন্দজীকে দেখলেই সেই মধ্য সামুদ্রিক গভীরতার কথা আমার মনে পড়ে। আত্মিক ঐশ্বর্যের সৌরভ তাঁর মুখাবয়বে নিরন্তর ধ্যানী প্রসন্নতার ছায়া বিস্তার করে ছিল। তাই যারা একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর কারুণিক দৃষ্টি ও স্নিগ্ধ প্রবচনের আকর্ষণে তাদের বার বার ছুটে আসতে হয়েছে। ভক্তজন তাঁর সংক্ষিপ্ত উপদেশে পেয়েছে মানসিক আশ্রয়, চিঠির ছত্রে ছত্রে পেয়েছে অমৃতের আস্বাদন।

সংঘ-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্যের তিরোধানের পর যখন তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুসারে সঙ্ঘের পরবর্তী সভাপতি পদে যথার্থ উত্তরসূরীরূপে স্বামী সচ্চিদানন্দের স্থান সুচিহ্নিত হোলো তখন এই সহজ, সরল, অনির্বচনীয় মানুষটির অসাধারণ কর্মকুশলতা ও চিন্তার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অনেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। অবশ্য ক্রান্তদর্শী যুগাচার্য যে তাঁর ভাবদীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে সেরা শিষ্যটিকে সঠিক নির্বাচন করতে পেরেছিলেন তার সম্যক্ পরিচয় উত্তরকালে সকলেই অনুভব করেছেন নিঃসংশয়ে।

মনে পড়ে, পূণ্য শিবরাত্রির সকালে আমি সস্ত্রীক কলকাতার মূল আশ্রমে উপস্থিত। আমার জীবনে সে এক স্মরণ্য প্রভাত; পরম প্রসন্ন অন্তরে সেদিন সঙ্ঘ সভাপতি বড় স্বামীজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের দুর্লভ সুযোগ লাভ করি। অবশ্য আমার পত্নী প্রথম কৈশোর জীবনেই তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় পুণ্য-শ্লোক ৺হীরালাল ঘোষ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্যের বাল্য সুহৃদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের নিভৃত পল্লী অঞ্চলে। তাই স্বভাবত ইস্পাত নগরী জামসেদপুরে ঘোষবাড়ি ছিল আশ্রমিক অধ্যাত্ম পরিবেশের একটি কেন্দ্রভূমি যেখানে এ শহরে প্রথম বার্ষিক ত্রিশূল উৎসবের সাড়ম্বর সূচনা হয় অগ্নিগর্ভ স্বামী বেদানন্দের মুখ্য উদ্যোগে। সেই উপলক্ষ্যে বড় স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ এ সহরে সম্ভব হয়েছিল। তারপর তিন দশকের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে।

শিবরাত্রির সকালে মহানগরীর মূল সঙ্ঘকেন্দ্রে দীক্ষা-প্রার্থী ভক্তজনের সংখ্যা স্বল্প ছিল না। তবু সেই ভীড়ের মধ্যে আমার দীক্ষাগুরু প্রাসঙ্গিকভাবে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তার প্রতিটি শব্দ ব্যবহারে এক ভূয়োদর্শী চিন্তা-নায়কের হৃদয় ও আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যোগ্য সন্তান চাই, তোমরা সন্তান দাও, না হ'লে গুরু মহারাজের এই বিশাল কর্মকাণ্ড আর রক্ষা করা যাবে না। আশৈশব শুচিতা, সংযম আর সৎশিক্ষার পশ্চাৎপট না থাকলে আগামী কালের সন্ন্যাসীরা এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের জীবন যাপন করতে পারবে না। একবার আদর্শ ভ্রষ্ট হলে সেই ছিদ্র দিয়েই বিষবৃক্ষের বীজ বোনা হবে। মাটির গুণেই গাছ পৃথিবীর গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দেয় অন্যথায় কেবল সূর্য্যের তাপ আর বরুণের কৃপা থাকলেও গাছ বেড়ে উঠতে পারে না।

সঙ্ঘের স্তম্ভস্বরূপ বিশিষ্ট স্বামীজীরা অনেকেই একে একে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছেন, সেই সব প্রাণ-প্রিয় যাত্রাসহচরদের মাঝপথে হারিয়ে মাঝে মাঝেই বড় শূন্যতা বোধ করতেন সদ্যপ্রয়াত সঙ্ঘ-সভাপতি। কখনো উদাস স্বরে বলতেন, একে একে কত তারা খসে পড়ছে, এরা আচার্য্যদেবের হাতে গড়া প্রহরী ছিল। এ শূন্যতা আর পুরণ হবার নয়। এত নিষ্ঠা, সাধনা আর ইচ্ছাশক্তির জোর যেন বাকিদের মধ্যে আর তেমন ভাবে খুঁজে পাচ্ছি না। এখন তো সিঁড়ি তৈরী, পায়ে পায়ে নজর রেখে কেবল এগিয়ে যাওয়া, তবু সে কাজও তো সোজা নয়। একটু ভুল কদমে সঙ্ঘের অনেক ক্ষতি হ'তে পারে।

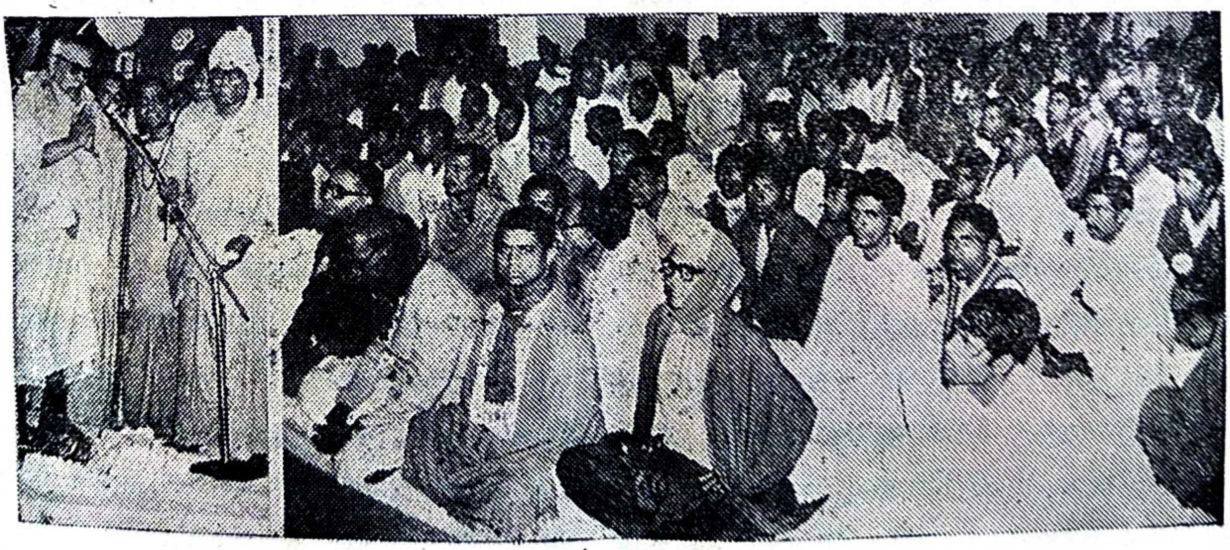
তিনি সংযতবাক্ ক্রান্তদর্শী পুরুষ ছিলেন। বৈষয়িক বা পেশাগত কাজকর্মে আমায় মহানগরীতে যখনই যেতে

রেখেছে, সবার আগে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে গেছি তাঁর চরণতীর্থে আশীর্বাদ প্রার্থনায়। কখনো দেখেছি বয়োধর্মে তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট প্রতিকূল, তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত তবু তারই মধ্যে কোনোভাবে আমার আগমনবার্তা কানে পৌছলেই কৃপা করে নগন্য সেবককে তাঁর ক্ষণ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠের দু একটি অমৃতবচন মহৌষধের মতো আমায় স্পন্দিত, উদ্বোধিত ও দুশ্চিন্তামুক্ত করেছে। তাঁর বাক্যে কোনো পূর্বপ্রস্তুতির প্রসাধন ছিল না তাই সেই অকৃত্রিম, অন্তরঙ্গ, অপত্যস্নেহ ভক্তহৃদয়কে আপ্লুত করতো, নয়ন অশ্রু বিধৌত হয়ে উঠতো।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের প্রকৃত ভাবানুসারী স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বভাবত সামাজিক চিন্তাদর্শে উদার ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময় আলোচনাসূত্রে দেখেছি, বাস্তব বিচারের আনুকূল্য থাকলে সামাজিক বিবাহসংযোগে তিনি বর্ণ, শ্রেণী বা জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিতেন না। পণপ্রথার পীড়ন ও নির্মমতায় তাঁর মানসযন্ত্রণা লক্ষ্য করেছি। আচারসর্বস্ব অন্ধ ভক্তিবাদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না কিন্তু যে কোনো-সৎকর্মের আশ্রয় রূপে ঐশ্বরিক চিন্তা ও বিশ্বাসকে তিনি আত্মরক্ষার কবচ বলতেন। একমাত্র অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের অভিমন্ত্রে বিধ্বস্ত মানুষও উত্তরণের মার্গনির্দেশ লাভ করতে পারে। তিনি আরো বলতেন, মৃত্যু মানুষকে ঈশ্বরের সাহচর্যদান করে তাই মৃত্যু শোক নয় সমর্পণ।

সঙ্ঘগুরুর আদিষ্ট পথে হিন্দুজাতির পুনর্গঠন, অন্ত্যজ মানুষের সেবা ও উত্থান, মনুষ্যত্বের শিক্ষায় যৌবশক্তির উজ্জীবন স্বামী সচ্চিদানন্দের সংকল্প ও কর্মব্রত ছিল। তাই সঙ্ঘের কর্মধারা আজ দেশের সকল প্রান্তে সম্প্রসারিত হয়েছে, সমুদ্রপারেও পরিব্যপ্ত হয়েছে। তাঁকে বলতে শুনেছি, সব গাছের বাড়বাড়ন্ত সমান হয় না। সঙ্ঘে কত সন্তান আসে, সকলে সমান নয়। সাধন-ভজন আর ত্যাগও সেবার পথ বড়ো কঠিন, অনেকে পিছিয়ে যায়। তবু আমি তো সকলকে নিয়েই চলি, সহজে কারো হাত ছাড়ি না। গুরু বীজ বুনেছিলেন মাটিতে, বেড়ে বেড়ে সেই গাছ বনস্পতি হয়েছে, কত ডালপালা ছড়িয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে গাছ আরো বড়ো হবে কিন্তু একে রক্ষা করতে হ'লে তেমন মানুষ চাই যারা ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের বল ভরসা হবে।

অগণ্য উত্তরসূরীর কাছে তাঁর বাণী পরম পাথেয়। তিনি যে অমৃতচৈতন্যে আজ সুসম্পুর্ণ, আমরা যেন উর্দ্ধমুখী হ'য়ে সেই আলোকতীর্থে অবগাহন করতে পারি।



কলিকাতায় রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত হিন্দু মিলন মন্দির মহা-সম্মেলনে পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন।

চিকিৎসকের ডায়েরী থেকে

মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ

অধ্যাপক ডাঃ পি, সি, দাস *

শনিবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

যথারীতি চেম্বারের কাজ সেরে গাড়ীতে বোসলাম। ড্রাইভারকে বললাম বালীগঞ্জ স্টেশানের কাছে চল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল 'আশ্রমে'? আমি বললাম 'হ্যাঁ'? কারণ গত বেশ কয়েক দিন ধরে নিয়মিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজজীকে পরীক্ষানিরীক্ষা করা আমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে পরিণত হয়েছে; মহারাজজী গুরুতর অসুস্থ। কিছু দিন আগে সুন্দরবন চব্বিশ পরগণার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে ঠাণ্ডা লেগে তিনি ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমো-নিয়াতে আক্রান্ত হ'ন, তারই চিকিৎসার জন্য আমার রোজ আশ্রমে যাওয়া, মহারাজজী বরাবরই হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ভক্ত, আমি প্রথম তাঁর উপর এলোপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করি, অবশ্য এতে তাঁর সম্মতি ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে এই চিকিৎসাই চলে আসছে, তাতে তিনি ভালোই আছেন। মাঝে মাঝে দু' একবার খুব বাড়াবাড়ির সময়ও এই চিকিৎসায় তাঁকে ভালো ক'রে তুলেছে, তবে এবারকার অবস্থা অনেক বেশি খারাপের দিকে। এলোমেলো চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। হঠাৎ দেখি কখন গাড়ী আশ্রমের দোরগোড়ায় হাজির। তিন চারজন আশ্রমের সাধু আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মহারাজজীকে পরীক্ষা করার জন্য দোতলায় তাঁর নিজ ঘরে গেলাম। রাত প্রায় এগারটা। এ সময় কোলকাতায় রাত্রির ঘোর আরম্ভ হয়, রাস্তাঘাটে যানবাহন কমতে শুরু করে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত রাস্তাগুলি জনাকীর্ণতার ক্লান্তি বিনোদনের চেষ্টা আরম্ভ করে। অধিকাংশ ঘরের বাতি নিষ্প্রভ বা সম্পূর্ণ নেভানো। আশ্রমেও এর ব্যতিক্রম থাকে না। এখানেও দিনের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টায় অধিকাংশ সাধুসন্তরা শয্যামুখীন হলেন। কিন্তু আজ এত রাত্রিতেও এখানে দিনের ব্যস্ততা বিদ্যমান। সব সাধুরাই এদিক ওদিকে ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। প্রত্যেকের চোখে মুখে অজানা আতঙ্কের ছাপ, কথায় বলে 'পুলিসে ছুঁলে বার ঘা', আমার মনে হয় বাধক্যে ছুঁলে মানুষের দেহে চল্লিশ ঘাকেও অতিক্রম ক'রে যায়। এ সময় মানুষের শরীরে বার্ধক্যজনিত বহু অসুখের আগমন ও সমাবেশ দেখা যায়। সাধু সন্ন্যাসীরাও এর হাত থেকে রেহাই পান না। তাঁর দেহে একের পর এক বহু অসুখের আগমন হয়েছে, যথারীতি তাঁকে পরীক্ষা করলাম, অবস্থা সত্যিই খারাপ। ভবিষ্য কর্মপদ্ধতি ও চিকিৎসা কি হবে, কি কি ওষুধ চলবে বা বাতিল হবে এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম, বহু অনুরাগীর বহু প্রশ্নের উত্তর ঠাণ্ডা মাথায় স্থির হ'য়ে দিতে লাগলাম। অসুখের প্রভাবে মহারাজজী এখন বেশ ঘোরেই রয়েছেন। একটু আধটু হ্যাঁ-না করতেও খুব কষ্ট হয়। তবুও জ্ঞান কতটা আছে দেখবার জন্য স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজজীকে বললাম, "আমি যে এসেছি মহারাজজীকে বলুন।" স্বামীজী মহারাজজীর কানের কাছে জোরে জোরে বললেন, "বাবা, বাবা, ডাক্তার বাবু এসেছেন,।" ডাক্তার পি. সি. দাস এসেছেন আপনাকে দেখতে।" এহেন অবস্থায় হঠাৎ আমি সহ ঘরশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ মহারাজজী স্বামীজীকে অতি স্পষ্টভাবে আদেশ করলেন, "একটা মালা দিতে পারনি, একটা মালা পরিয়ে দাও।" তখনই স্বামীজী এক নিমিষে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ প্রণবানন্দজীর মন্দির থেকে আশীর্বাদী মালা এনে আমায় পরিয়ে দিয়ে মহারাজজীকে জানালেন। যাঁর মুখ দিয়ে ক'দিন ধরে কোন কথা বেরোয় নি, তিনি কি ক'রে এরকম কথা বললেন এ নিজে একজন ডাক্তার হ'য়ে অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। মহারাজজীর মুখে একটা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে পেতেই তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হলেন। এই দৃশ্য এই ঘটনা প্রবাহের তড়িৎগতিতে আমি স্বভাবতই আশ্চর্য্য হ'য়ে

গেলাম। দীর্ঘদিন আমি যাঁকে চিকিৎসা করছি যিনি কখনও আমাকে এভাবে অভিনন্দিত করেন নি, তিনি আজ এমন করলেন কেন? মন এলোমেলো চিন্তায় জর্জরিত হ'ল। আমি চিন্তার খেই হারালাম. প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার যে, যখনই আমি মহারাজজীকে দেখতে আসতাম তিনি সবসময় আমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিয়েছেন। এমন কি শীতের মরসুমে পিঠেপুলিও খাইয়েছেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে মাথায় হাত দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। কতবার বলেছেন "তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমার ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না।" প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলে রাখি, আমি সঙ্ঘের আরো অনেক স্বামীজীদের চিকিৎসা করতাম। কিন্তু আজ যা' ঘটলো তা, কোনদিন কখন ও আগে ঘটেনি। কাজ শেষ হ'লে যখন আমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন যেমন আমরা মালা পরিয়ে দিয়ে বিদায় অভিবাদন জানাই এ যেন ঠিক সেই মত ব্যাপার মনে হ'ল। তিনি শুধু আমাকেই মালা পরিয়ে বিদায় দিলেন না; সেই সঙ্গে তাঁর পার্থিব জীবনের উপর বোধ হয় এবার ইতি টানলেন। সেইসময় প্রত্যেক সন্ন্যাসীদের মনও এই প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত হ'ল।

পরের দিন রবিবার, ৮ই জানুয়ারী।

আমার বহুদিনের প্রথানুযায়ী মাসের দুটি রবিবার আমার দেশের বাড়ী তমলুক শহরে যাই। ভোরের ট্রেন ধরার আগেই সবার অনুরোধে মহারাজজীকে একবার দেখে যেতে হ'ল, এখন আরো খারাপ অবস্থা দেখলাম। তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। যাই হোক, যথারীতি নির্দেশ দিয়ে ভোরের গাড়ীতে তমলুক রওনা হলাম। ফেরার সময় বিকেল বেলা অবশ্যই তাঁকে দেখে যাব স্বামীজীদের এ কথা দিয়ে গেলাম। তাঁর দয়ায় আমি কথা রাখতে পেরেছিলাম। হাওড়া স্টেশান থেকে একবারে সোজা আশ্রমে এসে তাঁকে আমি আমার জীবনে শেষ বারের মত পরীক্ষা করে যাই। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা সাতটা। তাঁর দৈহিক অবস্থা যে অত্যন্ত খারাপ ছিল, আর তিনি যে নির্বিকল্প সমাধির দিকে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তা' বলাই বাহুল্য। যে কোন দুর্ঘটনার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফেরার ঘণ্টা খানেক পরেই ঘন ঘন কলিংবেলের শব্দে নীচে নেমে দেখি দু'জন সন্ন্যাসী আশ্রম থেকে উপস্থিত। তাদের মুখে কোন বাক্য ছিল না। তাদের মুখের চেহারায় দুর্ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ করছিল। আমি অনুভব করলাম সব শেষ হ'য়ে গেছে। এই সময় তারা চাইলেন আমি যেন আর একবার এই বিপদের সময়ে আশ্রমে কিছুক্ষণের জন্য যাই! ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। আমি উনাদের সাথে রওনা হলাম। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, "আপনারা মহারাজকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করেছেন এরপর আর কিছুই করার ছিল না। আপনাদের দুঃখ করার কিছু নেই। তাঁর ঈপ্সিত স্থানেই তিনি গমন করেছেন। খবর তখনও বিশেষ ছড়িয়ে পড়েনি, আশ্রমে অন্য দিনের মতই ভীড় ছিল। মহারাজজীর ঘরে 'ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভো' নাম গান হচ্ছিল। আর আমার মনে হ'ল তাঁর সারা শরীর থেকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বার হচ্ছিল। স্বামী বিজয়ানন্দজী কাছেই ছিলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমায় বললেন, "কাল গুরুদেব আপনাকে মালা পরিয়েছিলেন, আজ আপনি তাঁকে শেষ মালা পরিয়ে দিন।" আমি একটা ফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিলাম। তারপর অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ বসলাম। খানিক সময় কাটানোর পর Death Certificate লিখে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। ফেরার পথে মন কেবল উদাস হ'তে লাগল। যে মহাপুরুষ আজ বিদায় নিলেন আমার মত সংসারী মানুষেরও অনেক কাছের লোক ছিলেন। আমাকে এত ভালোবাসতেন যে, আমার নাম শুনলেই এই মহাব্যাধির নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও কখন কখন তিনি চোখ মেলে আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করতেন। আমার আনন্দ শুধু এই যে, তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত মধুমাখা কথাগুলি নিজের কানে প্রবেশ করাবার অবাধ অধিকার পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিছক ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি ও সুদূর-প্রসারী ছিল। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে স্থুল শরীরে নেই সত্যি! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার গত কয়েক

বছরের যোগাযোগের ঘটনাপঞ্জী এখন মহারাজজীর সত্যিকারের মূর্ত্তি ধরে আমার হৃদয়ে চির জাগ্রত রইল। জীবনে জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে হাজার হাজার রোগী দেখলাম, অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও চিকিৎসা করলাম, কিন্তু এই মহাপুরুষের কাছে সেবা করার সুযোগে যা' দেখলাম, যা' পেলাম, তা' সবই অনুভবের, সবটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েক লাইন মনে পড়ে—

"... ... ...জানি তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে
তারা ক্ষণকাল তরে আমার জীবনে আসি
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ।"

* Prof. P. C. Das
M.D.(Cal.). F.I.C.A. (U.S.A.) F.C.C.P. (U.S.A.)
Professor and Head of the Department of Medicine. Calcutta National Medical College, Senior Visiting Physician, Chittaranjan Hospital, Extra Mural Teacher, College of Medicine. Calcutta University.

ভক্তের ভগবান

সে প্রায় ১৮/১৯ বছর আগেকার কথা। বছর দেড় দুই হ'ল পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হয়েছি। তাঁর ভাবধারা বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে প্রায়ই নানা রকম ভুল করে বসি। কোন সময় তিনি আমার এই অবোধ ভাব দেখে স্নেহপরবশ হাসেন। আবার কোন সময় শিক্ষা দেবার জন্যে স্নেহের শাসনও করেন—এইভাবে দিন কাটছে।

একদিন বেলা সাড়ে নয়টা-দশটার সময় তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। চিঠিটা বোধহয় খুব জরুরী ছিল। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। তিনি একমনে লিখে যাচ্ছেন। জানালার পাল্লা বন্ধ করেদিলাম। হঠাৎ ঘর অন্ধকার হ'ল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি করস্?" আমি ভয় পেয়ে বললাম—বৃষ্টি আসছে। তিনি বললেন "সে-কিছু না, খুলে দে।" আমি জানলা খুলে দিলাম। কিন্তু ঘরে বৃষ্টি সেভাবেই পড়ছে দেখে আমি আবার জানালা বন্ধ করায় ঘর অন্ধকার হ'ল। তিনি একটু বিরক্তির সুরে বললেন—"তোর জ্ঞান থাকা দরকার, আমি চিঠি লিখতে বসেছি, সঙ্ঘের কাজ দরকার হলে স্বামীজী মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে জানালা পাহারা দেবেন। জল আসবে না, জানালা খুলে দে।" আদেশ পেয়ে জানালা খুলে দিলাম। তিনি চিঠি লিখে চল্লেন। বৃষ্টি হচ্ছেই। আমি জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ঘরে আর জল এলো না।

আর একদিনের ঘটনা। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ রথযাত্রার পর কলিকাতা আসার জন্য পুরী ষ্টেশনে এসেছেন। তখন সকলেই একসঙ্গে একই বগীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আসতেন।

বলা বাহুল্য, আজ পরমপূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজেরও সকলের সঙ্গে একই বগীতে আসার ব্যবস্থা। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পুরী এক্সপ্রেস ষ্টেশনে আসার পর পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সকলে ভিজতে ভিজতেই ট্রেনের মধ্যে মাল উঠালাম। আমাদের নির্দিষ্ট বগীটা শেডের বাইরে ছিল। শ্রীমৎ ওঁকারানন্দ স্বামীজী পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজকে নিয়ে শেডের নীচে অপেক্ষা করছেন। এদিকে ট্রেন ছাড়তেও খুব বেশী আর দেরী নেই। বগীর মধ্যে তাঁর আসন করা হয়েছে। মালপত্র সাজানো হয়েছে। এবার শুধু তাঁর উঠার অপেক্ষা। ছাতা নিয়ে আমরা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছি। কিভাবে তাঁকে নেওয়া

হবে, নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। তিনি আমাদের এই অবস্থা আর বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য তাঁর চিন্তা—বৃষ্টিতে ভিজে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। এইসব কথা হতে হতেই শ্রীমৎ ওঁকারানন্দ স্বামীজী তাঁকে বললেন—"এবার চলুন, আর দেরী করা যায় না।" শুনে তিনি বল্লেন—"চল যাই।" সেদিন আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম—ঠিক যে মুহূর্তটা তিনি বগীতে আসলেন ঠিক সেই সময়ে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আচমকা বৃষ্টিটা থেমে গেল। তিনি ট্রেনে ওঠার সাথে সাথেই আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়তে থাকল!

আর একবারও তিনি রথের পরে পুরী থেকে ফিরছেন। এবার পূজ্য শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীজী ও শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামীজী উপস্থিত আছেন। সকলকারই টিকিট রথযাত্রার পরের পরের দিন। এবার শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীজী রথের পরের দিন সকাল বেলা এসে শ্রীমৎ বড় স্বামীকে রাত্রের গাড়ীতে কোলকাতা রওনা হয়ে যেতে বললেন। যাতে আগামীকাল এই ভীড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট না হয়। তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী সহ আমরা কয়েকজন কলকাতা এসে পৌছলাম। আদেশ মতো পরের দিন ট্রাক ও গাড়ী নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে জানলাম—গাড়ী আসতে দেরী আছে। বন্যায় রেল লাইন ডুবে গেছে। পুরী এক্সপ্রেস আসতে পারছে না। আমরা আশ্রমে চলে এলাম। তৃতীয় দিন রাত্রি প্রায় দশটায় সকলে ফিরলেন। সকলের শরীরের সে কি করুণ অবস্থা! শ্রীমৎ স্বামীজীরা সহ প্রায় সকলের মুখে এক কথা—শ্রীমৎ বড়স্বামীজী কি অদ্ভূতভাবেই না আগের দিন চলে আসলেন। অসুস্থ শরীরে তিনি এই অবস্থার মধ্যে পড়লে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হোত! পরের দিন সকালে এসব আলোচনার সময় পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ বললেন—"তিনি কি ভাবে যে রক্ষা করেন তা তিনিই জানেন!"

সেবার শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ নবনির্মিত শ্রীগুরু-মন্দির উদ্বোধন করতে শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। বিকালে দার্জিলিং মেল। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ। সাধারণতঃ ফার্ষ্ট ক্লাসে টু বার্থ ক্যুপ রিজার্ভেশন করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফোর বার্থে অন্যলোকের মধ্যে উঠলে তাঁর একটু অসুবিধা হয়। ট্রেন ষ্টেশনে পৌছানোর পরে আমরা জানতে পারলাম তাঁর রিজার্ভেশন ফোর বার্থ এ হয়েছে। বাইরে থেকে রদ বদলের কোন উপায় নেই। গাড়ী ছাড়তেও বেশী দেরী নেই। আমরা তাড়াতাড়ি মাল উঠিয়ে ফেললাম। ক্যুপের মধ্যে দেখি বিশিষ্ট সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু তার মধ্যে আছেন। শ্রীমৎ বড় স্বামীজী যদি এর মধ্যে না যেতে চান এই ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ, সম্মানিত লোকদের তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতেন। তাঁদের সামনে কোন কিছুই করতে চাইতেন না। ঠিক তাই হ'ল। সব দেখে শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর স্বামী হংসেশ্বরানন্দজী তাঁকে বললাম—"আপনি একটু বসুন, আমরা দেখি কি করতে পারি। একটা টু বার্থ ক্যুপে দেখলাম স্বামী-স্ত্রী বসে আছেন। আমরা তাঁদের পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের বয়স ও শারীরিক অবস্থা জানিয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে লাগলাম আসন বদল করার জন্যে। বার বার অনুরোধেও তাঁরা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। এই কথাবার্ত্তা শুনে পাশের টু-বার্থ ক্যুপের ভদ্রলোক অযাচিতভাবে এসে বললেন—"আমাদের ক্যুপে নিয়ে আসুন, আমি ছেড়ে দিচ্ছি।" আমরা বললাম—"আপনাদের মালগুলো আমরা বাইরে রাখি। উনাকে আমরা এখানে নিয়ে এসে আপনার মাল আমরা পৌছে দেব।" এইবলে যেই আমরা সেই মালে হাত দিয়েছি আশ্চর্য্যের কথা কোথা থেকে আর এক ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিতভাবে এসে আমাদের জিনিসপত্রসহ পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজকে নিয়ে আসতে বিশেষ সাহায্য করলেন। আবার ঐ সহৃদয় ভদ্রলোকদের জিনিসপত্রও বিশেষ তৎপরতার সহিত ফোর-বার্থ ক্যুপে পৌছে দিলেন। চলন্ত গাড়ীতে ঐ আগন্তুকের সাহায্য ছাড়া আমাদের দুজনের পক্ষে এই কাজ দুষ্কর হয়ে পড়তো। যে পরিবারটি স্বার্থ ত্যাগ করেছিল তাদের নিয়ে এসে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর সহিত দর্শন করিয়ে প্রসাদ দিয়ে দিলাম। এবার সাহায্যকারী আগন্তুক ভদ্রলোকটির সন্ধানে বেরিয়ে সবগুলি ক্যুপ খুঁজেও তাঁকে দেখতে পেলাম না। বাথরুমগুলোর কোনটাতেও

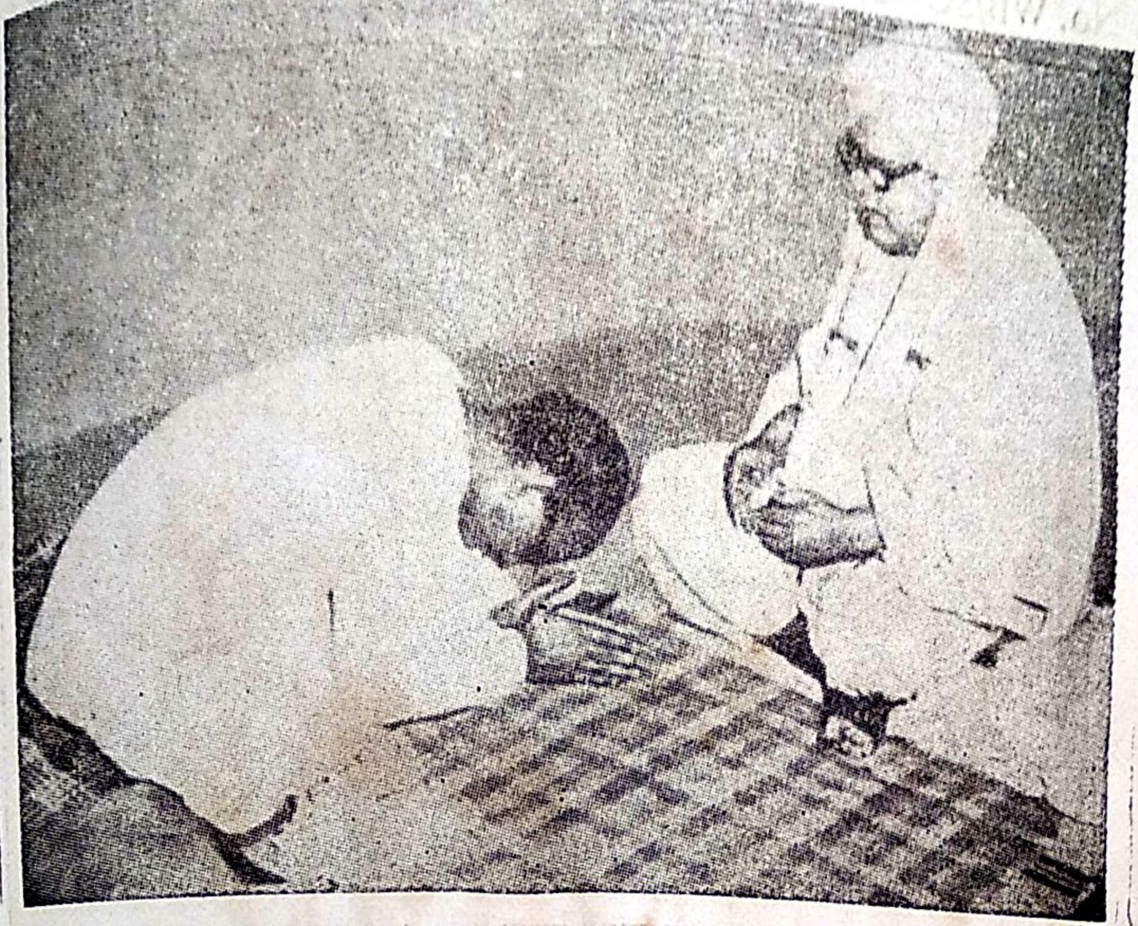
নেই, কৌতূহল বেড়ে গেল, তখন আমরা দুজনেই আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে কোথাও পেলাম না। এর মধ্যে কোন ষ্টেশন আসেনি। ট্রেন কোথাও থামেও নি। সেই বগি দিয়ে অন্য বগিতে যাবার রাস্তাও ছিল না। তথাপি ভদ্রলোককে পাওয়া গেল না। একজন সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সেই মুহূর্তে ঐ ভাবে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে থেকে অন্তর্ধান হওয়াটা বিস্ময়কর! এই অলৌকিক ঘটনা শুনে শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"এ যে কি রহস্য, এ যে তাঁর কি করুণা, আমার মতো নগণ্য সেবকের প্রতি তাঁর এ যে কি অসীম দয়া—তা কি করে বোঝাব।"

আমি রাখি যারে কে মারে তাহারে
আমি মারি যারে কে রাখে তাহারে
বাঁধা থাকি সদা ভক্তের দুয়ারে।
ভক্তির অনলে সঁপেছি প্রাণ,
ভক্তির কাঙ্গাল আমি চিরকাল,
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ ॥

—সঙ্ঘভৃত্য

প্রণব, বর্ষপঞ্জী—১৩৯৫

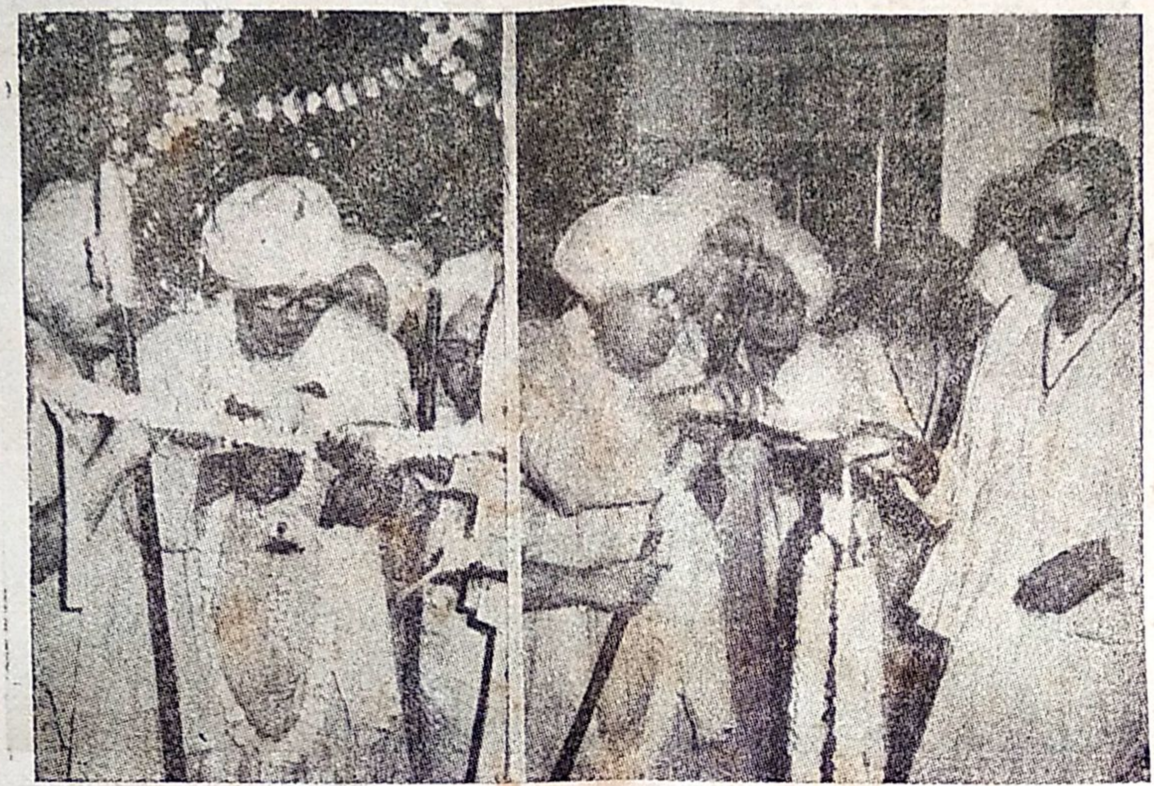
কবিতা





উপরে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ভূমি সংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী এবং নীচে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য কলিকাতা প্রধান কার্যালয়ে এসে শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর সাহিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন।

Cent. Reg. No.-2627/57
Reg. No. WB/SC—255



বামে গঙ্গাসাগর সেবাশ্রমের শিবমন্দির ও ডানে ডায়মণ্ড হারবার সেবাশ্রমের নূতন যাত্রী নিবাসের উদ্বোধন করছেন পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী।



বন্যা বিধ্বস্ত হাওড়ার আমতায় সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন কলোনীর উদ্বোধন করছেন পূজ্য শ্রীমৎ বড় স্বামীজী।

প্রণব কার্য্যালয় : ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, ফোন : ৪৬ ১১৭৮ হইতে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত এবং তদ্বারা ক্লাসিক প্রেস, ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ। গুপ্তপ্রেশ, ৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯।